KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫ নবীন সরকার লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : হীরেন্দ্রনাথ মোদক
Title : উদ্বোধন	Size : 5"X8" 12.70X20.32 c.m.
Vol. & Number : ১/১ ১/৪ ১/৫	Year of Publication : আষাঢ়, ১৩৪১ ফাল্গুন, ১৩৪২ আষাঢ়, ১৩৪২
	Condition : Brittle Good
Editor : হীরেন্দ্রনাথ মোদক	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

কোন একটি ardent suffragette Ellis সাহেবকে লিখেছেন যে :—

"The voice of the people hardly now seems to be the voice of God but much more like the braying of a donkey. Not that democracy is thereby invalidated. A country mainly inhabited by donkeys should and must be governed by donkeys and for donkeys".

এ হচ্ছে democracyর বিলেতি বীরবলী সমর্থন। এর উত্তরে বাঙালী বীরবল বলতে পারেন যে, গাধা পিটেও ত ঘোড়া হয়—যে ব্যাপারের বিলেতী নাম হচ্ছে education। আ আমরা সকলেই masseducationএর পক্ষপাতী। আর ঐ উপায়েই আমরা ডিমোক্রাসী গ'ড়ে তুলব। এই ককশা মেয়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, এবং পুরুষের কথা শোনা যাক্।

South Africaর প্রধান মন্ত্রী General Hertzogএর মত এখন বলছি। ইনি হচ্ছে Ellis সাহেবের মতে "the responsible representative of the mass man, the cle of democracy, a man whose high character and ability are generally recognised." এখন এই democracyর গণ্যমান্য কর্ণধারের কথায় কর্ণপাত করা যাক্।

তাঁর বক্তৃতাটি একটু লম্বা, সুতরাং তার সংক্ষিপ্তসার নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"He declares that the future of civilization must not be delivered up democracy, since the average level of intelligence is not high enough, a there is no ground to believe that the mere extension of education c raise the intellect of a country or eliminate self-interest."

এখন দেখা যাচ্ছে, যে ইংরাজী মহিলাটি মেয়েদের voteএর অধিকার লাভ করবার জ প্রকাশ্য সভাসমিতিতে আর পাঁচ জনকে আঁচড়েছেন কামড়েছেন—যেহেতু তিনি হচ্ছেন একজ ardent suffragette—তিনি ও General Hertzog বিষয়ে একমত; যদিও General Hertzog দেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য নখদন্ত ব্যবহার করেন নি, ছুঁড়েছেন গোলাগুলি।

তবে তাঁর কথার নূতনত্ব এই যে, তিনি Educationএর alchemyতে বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ পিতলের কানে শিক্ষার মন্ত্র দিলে তা যে চোখের পলক না পড়তে সোনা হ'য়ে ওঠে— যাদুবিদ্যায় তাঁর আস্থা নেই। আমাদের যে আছে, তার কারণ আমরা masseducation ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত নই; কিন্তু ইউরোপীয়েরা বিশেষ পরিচিত।

সে যাই হোক্, democracy সম্বন্ধে democratic দেশের লোক যে disillusioned হ তার হাজার উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু democracy নামক realityর উপর বিরক্ত হ'য়ে democracy নামক ideal এর দিকে পিঠ ফেরানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ rea ideal নয়। তা' যদি হ'ত তাহলে ideal কথাটাই জন্মলাভ করত না। ডিমোক্রাসী বর্ত্তম যে রূপ ধারণ করেছে, তা দেখে অবশ্য মন প্রসন্ন হয় না—তা সত্ত্বেও আমরা যে তার ideal কোল থেকে নামতে চাইনে, তার কারণ এই বেয়াড়া realityর পিঠে চড়বার আমা

সপ্তক

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মৈত্র

মেষপালিকা—

Alice Mynnel এর কবিতা হইতে।

আনন্দরূপিণী মোর নিতি যায় আসে,
মেষ-পালিকা সে।
আমার ভাবনাগুলি মেষপাল, সম্মার্জ্জনে তার
কুন্দকান্তি ; সে তাদেরে আগুলিয়া রাখে অনিবার।
নাই পড়িবার ভয়, পাহাড় নির্ভয়ে তা'রা চরে,
সুরভিত সানু'পরে, ফিরে ঘরে সুখনিদ্রা তরে।

মাতৃস্নেহ ভরা গিরিশিখরে সে করে বিচরণ
শুভ্রালোকে, ছায়াসম নিরাপদ উপত্যকা পরে,
গোপন নিভৃতে যার অনাবিল তারার কিরণ
পড়ে ঝরি নিঃশব্দে-ধ্যানমৌন নিশি দ্বিপ্রহরে।
আনন্দরূপিণী মোর ফিরে আসে পাশে,
মেষপালিকা সে।

চোখে চোখে রাখে সদা ছোট ছোট চিন্তাগুলি, জানি ;
চঞ্চল আনন্দে তারা লম্ফে লম্ফে করে ছুটাছুটি ;
যেন বেড়া দিয়া ঘেরি' রাখিয়াছে সরলতাখানি,
আত্মরক্ষা করে বালা, সে বেষ্টনী নাহি পড়ে টুটি।
আনন্দরূপিণী মোর সে মেষপালিকা,
হয় শ্রেয়পালিকা।

দুই কবি—

বল দেখি কার' বাণী
সঙ্গীবিহীন ঝাউশাখা 'পরে মর্ম্মর দিল আনি ?
ছিল ঝোড়ো হাওয়া নিঃসঙ্গ সে দূর পশ্চিম কোণে,
দুর্ব্বার বল, মুখে নাই ভাষা ! শাখীও উতলা মনে,
মৌন বেদনা ভরে,
ভূধর শিখরে ছিল পথ চাহি' ঝঞ্ঝাবাতের তরে।

দুটি স্মৃতি বুকভরা,
দুটি বিক্রম, দুটি প্রতিজ্ঞা, দুটি বেদনায় ধরা
অটুট মৌন করে জড়াজড়ি ; একটি আর্ত্তরবে
ক্রন্দন-মাল্য গাঁথে যেন তারা পল্লবে পল্লবে !
অতীতে নিহিত ছিল
যে উদ্দেশ্য দুটি স্বাতন্ত্র্যে, ভুজপাশে ধরা দিল ?

ঝরে কা'র সুরধুনী ?
'একি বাণী মোর ?' 'অথবা তোমার ?' 'কহ তুমি ?'
'আমি শুনি ?'
'এ ধরায় তব ছিল নাক কেউ, তোমা লাগি এহ নামি' !
'শূন্য গগনে ছিলে পথহারা, তোমারে বাঁধিনু আমি !'
হে পথিক অমরার,
আমার কণ্ঠে ফুটিল যে বাণী, সে তোমার,—সে তোমার !

কবিপত্নী

উর্ম্মিসিন্ধুবলয়িত হেরিলাম অকূল জলধি,
সিকতার ভুজবন্ধে যেন আধো-ঘেরা,
আকুল তরঙ্গ-ভঙ্গ উথলিছে দিগন্ত অবধি,

ঝঞ্ঝার আগল লঙ্ঘি' ধায় নিশীথিনী অভিসারে,
সুনীল নয়ন ফাঁদে বাঁধে যে উদারে।

হায় কবি, তুমি কি গো সাগরের চেয়ে সঙ্গীহীন ?
অগম স্তব্ধতা আর তরঙ্গ বিপ্লবে
সুদূর স্বতন্ত্র তুমি, চিন্তা-সিন্ধু, স্বপনে রঙ্গীন ?
এখনি শতধা ভাঙি পশ্চিমে পূরবে
ছড়ায়ে গেলে যে তুমি প্রেয়সীর একটি চুম্বনে,
গড়েও গড়নি ধরা গাঢ় আলিঙ্গনে।

অকালে

আমি না চাহিতে তবু কোথা হ'তে এলে, মোর গান ?
এই হিমঘনমাঘে এ নীরব কবির হৃদয়,
অকস্মাৎ কি অজানা আনন্দে করিলে মধুময় !
শীতের কুসুম মোর, জানি না তুমি সে কা'র দান !
মোর মৃতবসন্তের তুমি কি গো অন্তিম সন্তান ?
নিদাঘের শেষ তৃষ্ণাসটকু রক্তে তব বহে ?
অথবা আমারি মাঝে এতদিন সংগোপনে রহে
যে বসন্ত, আজিকে সে তরুণে হয় অন্বেষ্টান ?
অতীতে, আগামী প্রাতে, কোনদিকে অযোঘিব বল
তোমার সমান-গন্ধী পুষ্প লাগি, গোপনের ধন !
তুমি মোর অতীতের অথবা তনয় ভবিষ্যের ?
আমার দুখের মুখে তুমি শেষ হাসি নিরমল ?
অথবা অসহায়, মহানন্দ মত্ত অবন্ধন ?

সুরক্ষিত—

ললিত যৌবন তরে নাহি তব যতনের লেশ।
ফুল্লমুখে স্বর্গপানে চেয়ে রও, চাহ না রক্ষিতে
শ্রেষ্ঠ স্বপ্নাবলী তব, কাল যাহা চাহে বিধ্বংসিতে।
আছে তারা মোর কাছে, স্বর্ণপদ্মে পাবে নবোন্মেষ।
সুদূর ভবিষ্যে যদি অন্বেষ কর ধ্বংস-শেষ,
শেফালির পারা যারা ফুটেছিল তোমার অতীতে,
এস তবে মোর কাছে ; স্বপ্নজায়া নাই আবশীতে,
মোর প্রশান্তির মাঝে পাবে তুমি তাদের উদ্দেশ।
কালের কবল হ'তে রক্ষিত আনন্দ-ক্ষণগুলি
অক্ষয় ভাণ্ডার সম পূর্ণ রবে ঋদ্ধিতে তোমার,
সে বিগত স্ফূর্তি হর্ষ বিষাদের রত্ন দীপমালা
রবে তব বক্ষে মোর ; বসন্তের রাখিব আঙুলি'
তব পুষ্পরক্ষীজ্ঞানে মন্থপূত নন্দনে আমার।
মোর স্মৃতিবীথিকায় নমিবারে এস স্ববালা।

নিষেধ—

কেন তবে হেন অভিমান ?
ফুটেছ যে পূর্ণতায় লঙ্ঘিয়া আমার প্রত্যাখ্যান।
জেনো মনে, নিশ্চিত জানিও,
আমার এ অস্বীকৃতি অমলানিধি যে তব, প্রিয়।
অলঙ্ঘ্য সে বারণ আমার,
প্রথম ফুরেনি রুদ্ধ কোরা লাগি সুধা আপনার।

একটিমাত্র বেদনায় পরালাম রাজার মুকুট
ভালে তব, সে অমোঘ বাণী মোর রাখিয়া অটুট।

হে বলিষ্ঠ অমল-হৃদয়,
অসম্মতির উদাগমে সুখী প্রেম যেমন নির্ভয়,
তেমনি এ মানার মানত,
চুম্বনে বঞ্চিত করি তোমারে যে করিবে মহৎ।
মোর অর্ঘ্য-নিবেদের বিধি,
সযত্নে রক্ষিব আমি তোমা তরে এ অমূল্য নিধি।
তোমার গৌরব রক্ষা, এই মোর শ্রেষ্ঠ অধিকার,
সাধ্য নাই, করি আশা অংশী হ'তে তব নিরাশার।

বিদায়ান্তে—

বিদায় নিয়াছি কবে, তোমারে করেছি পরিহার,
কভু উচ্চারি না তব নাম।
তোমারে বর্জ্জন করি পুণ্যার্জ্জন হ'ল না আমার!
তোমারি নিকটে দেবধাম,
স্বর্গগামী চিন্তা মোর থামে আসি' দুয়ারে তোমার।
প্রতি মন্দিরের পথ তুমি যে গো রয়েছ আগলি'।
কেঁপে উঠি সেখানে আমার,
হেরি যবে মন্ত্রে মোর মূর্ত্তি তব জাগিছে কেবলি!
কোনো দুর্ব্বলতা পরিহার
করি যবে, হেরি তব মুখে হাসি ওঠে যে উথলি'!
কেমনে তোমারে বল আমা-হতে দূরে ঠেলে রাখি?
তোমা পানে ধায় নিশিদিন
মোর পরিণতি, আশা, কাব্য, ধর্ম্ম,—যাহা লয়ে থাকি।
তোমাতে যে নীরবে নিলীন
আমার সকল ধারা। ছাড়ি নীড় উড়ে যায় পাখী।

ডায়েরীর পাতা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫শে জ্যৈষ্ঠ।

অনেকদিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান কর্ত্তে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্র দীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু ডাকা বনানী,—উষ্ণ মণ্ডলের এই অপূর্ব্ব বন সম্পদ, স্বচ্ছজলের মধ্যে সঞ্চরণশীল মৎস্য রাজি, নির্ম্মেঘ নীল আকাশ, আমার শিরায় শিরায় কেমন এক প্রকার মাদকতার সৃষ্টি করলো।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics এর শ্যামল সৌন্দর্য্য, রৌদ্র করোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্ চক্রবালের উদার প্রসারতার মধ্যে এই জলধারা পান ক'রে, দিন রাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শুনে শৈশবে মানুষ হ'য়েছিল গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা কত ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। সে মানুষ হ'য়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছ পালা, লতা পাখী, ফুলফল, সূর্য্য এদের। এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে এলুম,—তারপর গেলুম কাটাখালির পুলটাতে। ঝিরঝিরে বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হোল, এমন এক অপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরে উঠলো সারা গা এমন শিউরে উঠলো, সে পুলকের সে উল্লাসের তুলনা হয় না। গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ও রকম আনন্দ পাইনি।

আজ চলে যাবো তাই বিদায় নিলুম। বিদায় জ্যাঠা মশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইচ্ছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না; কিন্তু তোমার ফলে জলে পুষ্ট হয়েছি; তোমার অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রথম স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিল দশ বৎসরের বালকের চোখে; তোমার গাছ পালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কল-কাকলীতে জীবন নাট্যের অঙ্ক সুরু; বিদায়, বিদায়! যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে হয় যুগে যুগে এই জন্ম মৃত্যু চক্র কোন এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্ছে। হয়তো ছ'হাজার বছর আগে জন্মেছিলুম ঈজিপ্টে, সেখানে নল খাগড়ার বনে, নীল নদের রৌদ্র দীপ্ত তটে, কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই বন্ধু বান্ধবদের দলে এক অপূর্ব্ব শৈশব কেটেছে। তারপর এতকাল পরে আবার চারটি বছরের জন্যে এসেছি এখানে—আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই বোন, অন্য বন্ধুদল। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে! এই Cycle of birth and death যিনি নিয়ন্ত্রিত কর্চ্ছেন, আমি তাঁকে কল্পনা ক'রে নিয়েছি; তিনি এক বড় শিল্পী; এই সকল জন্মের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা হয়তো কোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার পৃথিবীতেই জন্মাবো, ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেছে ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরছে, তার জগতে যেতে পারি, বহুদূরে globular cluster দের জগতে যেতে পারি; কে বলবে এসব শুধুই কল্পনা-বিলাস? এ যে হয় না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব; বৃহত্তর জীবন চক্র যুগে যুগে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এই ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্ছে।

শত শত জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ জয় হৌক সে দেবতার। তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় হউক, নিত্য সৃষ্টি জয়মান হউক তাঁর প্রাণ চক্রের নিত্য আবর্ত্তন শীল বিশাল পরিধিতে।—

গুন্ গুন্ ক'রে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল:—

গভীর আনন্দ রূপে দিলে দেখা এ জীবনে,
হে অজানা অনন্ত—

নিজেকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বুঝেছি তুমি কত বড় স্রষ্টা।—

হঠাৎ সারাদেহ এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠলো! ওপারে মাধবপুরের বটগাছের সারি, বেলডাঙ্গার গ্রামের বেহু-বনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দুলছে—আউশ ধানের ক্ষেতের আইল পথ বেয়ে কৃষক বধূ মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসছে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ীর মাথায় শুকতারা উঠেছে; মনে হোল আমি দীন নয়, দুঃখী নয়, ক্ষুদ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়; আমি জন্ম জন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর থেকে কোন সুদূরে নিত্য নূতন পথহীন পথে আমার গতি; এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী আমার পায়ে চলার পথ, নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের সমাপ্তিহীন হোক।

ডায়েরীর পাতা

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হোল না, গুলকীর সঙ্গে দেখা হোল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হোল না, দেবব্রতের সঙ্গে হোলনা। অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্ছে মনে পড়ে। 'চরণ বৈ বধূ বিন্দতি' চলা দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১; বৃহস্পতিবার।

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী এসেছি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য এবার বেশী ক'রে চোখে পড়চে। সমস্ত গ্রামটা যেন একটা পার্ক, আমার বাড়ীতে কোন গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম, এমনকি কুঠীর মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন, এ সবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে,—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই। এমন সবুজ মাঠ উলুফুল ফুটেছে চারিধারে শিমুলগাছ হাত বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দূর বনান্ত শীর্ষে বিরাটকায় lary পাখীর পুচ্ছের মত বাঁশবনের মাথা দুলচে! এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী,—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই।

দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম। উঠে দেখি মেঘ করেছে উত্তর পশ্চিম কোণে,—ঘন নীল কৃষ্ণ কাল-বৈশাখীর মেঘ, তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি নদীর ঘাটে চলে গেলাম। পথে জেলি বল্লে—"শীগ্‌গির্ যান, ভয়ানক আম পড়চে।" কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কাল বোশেখীর লীলা দেখতে চাই।

নদীজলে নামবার আগে বৃষ্টি এল; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগলো। জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপারে ওপারে সাঁতার দিতে লাগলাম। কালো জলে ঢেউ উঠেছে, মুখে, নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙ্গে পড়চে, ও পারের চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রে বুড়োর গাছ ঝড়ে উল্টে যাচ্চে। বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ন ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা; প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাত ধরাধরি করে চলা, ঐ শ্যামল ডালপালা ওঠা শিমুল গাছ, সাঁই বাবলা গাছ,—এই তো আমি চাই যে, এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করবো। ঐ ঝোড়ো মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে

এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে……।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলুম। তারপর নদী জলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহমন যেন আপনা আপনি নুয়ে পড়তে চাইল। এ ধরণের ভক্তি একটা বড় bliss জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে, এ realisation যেমন দুর্লভ, তেমনি অপূর্ব্ব।

আমি ভগবানের উপলব্ধ করতে চাই এই তাঁর লক্ষ বিরাট রূপের মধ্যে দিয়ে।

২৮, ২, ৩৩

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। কেন এসেছিল তাই জানি না। মাত্র আট মাস বেঁচে ছিল, কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্প দিনের মধ্যে তা কাকে বলি? ও আপন মনে হাসতো, কিন্তু সবাই বলতো "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখ্‌চে?" ওর অপরাধ জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইতো না। ওর বাবা তো মারা গেল, ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হোল, ওকে কেউ দেখতো না। ওর খুড়ীমা বল্লে "টাকা পাইতো ওকে মাইয়ের দুধ দি।" ওকে নারকোল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখতো উঠানে আমার কষ্ট হোত কিন্তু আমি কি করবো? আমিতো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে? ওর রিকেটস্ হোল। দিন দিন শীর্ণ হ'য়ে গেল তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসতো, সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেচি, ও শনিবারে যখন বাড়ী থেকে আসি। unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হোয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে।……মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি,—এছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথায় রেখে যায়নি ও। Poor little mite!

কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত। এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটু ফুলের দল ফুটেচে—ছুলে ছুলে কতকাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবন ধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন ও নিত্য,—খুকীর হাসিও তেমনি। পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারা ভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে, এই ঘূর্ণায়মান বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টি-মুখী নীহারিকার প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি, এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য,—তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচি মুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলবো তা' আরও বড়, এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন

একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মনীতি আছে, উদীয়মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোক সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থ যুক্ত করে। এই জন্যে অর্থযুক্ত করে যে, যে বর্ণের গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েচে, সেই বর্ণ সবিতার দান। আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠীতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেচেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন। মাটির মৃত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ঐ অমৃত জ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা' বিশ্বের জড়পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে গৌরবময় করে। তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়, তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েছে সৃষ্টির অধ্যাত্ম নীতির আইনে ও ওর সত্য অস্তিত্ব অনুভব কর্ত্তে পারি অন্তরতম অন্তরে কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না

মৃত্যুদূত

— গল্প —

—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

জয় হোক জগদীশ্বরের। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় এবং সর্ব্ব করুণার আকর।.....

ইহা এক মহাপুরুষের মৃত্যুর উপাখ্যান,—তাঁহার আত্মার শান্তি হউক!—অবিশ্বাসীরা যাহাতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করে সেই উদ্দেশ্যেই ইহা কথিত।

তাহারা বলে—"তাঁহাকে কখনই দেখি নাই বা এখনও দেখিতেছি না।" কিন্তু বাদুড় যে চক্ষে দেখিতে পায় না তাহাতে সূর্য্যের কোনো অপরাধ নাই। মনুষ্য-হৃদয় যখন নিতান্তই কিছু বিশ্বাস করিবার বস্তু চায়, কিছু অবলম্বন যখন তাহার প্রয়োজন—তখন পেচকের আশ্রয় কামনা করিয়া লাভ কি? বাসুকীর অস্তিত্ব কদাচ এই পৃথিবীতে না থাকিলেও বাসুকীর আশ্রয়ে আমরা বাস করিতেছি এ কথা কল্পনা করা বরং উত্তম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিধাতার অভয়করের স্পর্শ যে আবহমান কাল হইতেই বর্ত্তমান তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং কল্পনার কোনো প্রয়োজন নাই।

ধূর্ত্ত শৃগাল সিংহের পশ্চাদনুসরণ করে: কারণ সিংহ জানে শিকারের সন্ধান কোথায়, সিংহের ভুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়া শৃগাল আপনার প্রাণ ধারণ করে। সেইমত হীরু জাতি একদিন তাহাদের মহাপুরুষকে অনুসরণ করিয়া মিশর দেশ ত্যাগ করিয়াছিল। বিধাতার অনুগ্রহে তিনিও তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শৈশব কালে এই মহাপুরুষ নিদ্রা-জাগরণের সুখ ও স্নেহের আনন্দ যথেষ্টই পাইয়াছেন। রাজার ঝিয়ারীর কোলে তিনি দোলা খাইয়াছেন: সুডোল এবং সুগোল সেই কন্যার বাহু সর্পদেহের ন্যায় মসৃণ,—রৌদ্রতাপে সুপক্ক ফল যেমন উত্তপ্ত হয় তেমনি সে বাহুর কোমল উষ্ণতা। ফুল্লদৃষ্টিতে সে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিত দুটি জলন্ত ও সুগভীর কৃষ্ণতারকা কৌতূহলে নিবিষ্ট করিয়া; আপন কোমল বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে তাঁহাকে চুম্বন দিয়াছিল: কৌমার্য্যসুলভ ব্রীড়াভরে নিবিড় আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার নিশ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই সকল কথা স্মরণ হইলে অনেকেই ক্ষোভ করে—"আহা, কেন তখন আমি সুখ হইলাম না।" কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সময় আছে।

মিশরের ফারাও-রাজা তাঁহাকে দিয়াছিলেন রাজ-নিদর্শন যুক্ত অঙ্গুরীয় এবং সভাসদের পরিচ্ছদ। প্রভাতকাল অতিক্রম করিয়া যখন রৌদ্রতাপ প্রখর হইয়া ওঠে: বিপণি-সঙ্কুল রাজপথে যখন জাফরাণ যুক্ত মশলার আঘ্রাণ খরিদ্দারগণকে প্রলুব্ধ করে: গৃহস্থের রন্ধনশালা হইতে যখন গোধূমচূর্ণদাহের গন্ধ পাওয়া যায় এবং নদীতীর হইতে আর্দ্র বায়ু ভাসিয়া আসে: বিশাল নদীবক্ষে যখন নৌকাগুলি বড় বড় সাদা পাল তুলিয়া জোড়ে জোড়ে একসাথে মন্থর-গতিতে ভাসিয়া যায়, এবং কচিৎ এক একটি বিরল-শ্মশ্রু স্থূলচর্ম্ম মহিষ নদীতীরস্থ পঙ্ক-শয্যা হইতে মুখ তুলিয়া অলস দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া থাকে:—ঐ ক্ষমতাদৃপ্ত মহাপুরুষ সেই সময় আত্মশ্লাঘা ভরে আপন শকটে আরোহণ করিয়া মাঠে মাঠে কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেন ও কেহ আলস্যে কাল কাটাইতেছে দেখিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করিতেন বা তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেন, এবং এইরূপে আপন কর্ত্তব্য করিতেছেন মনে করিয়া সময়ান্তরে কোনো নারিকেল কুঞ্জের ছায়াতলে গিয়া পরম নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দশবৎসর যাবৎ বিবাহিত জীবন যাপন করেন। উন্নতবংশীয় ধনীকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়; রাত্রিকালে তিনি উহার সহিত সঙ্গমসুখ লাভ করিতেন, —এবং দিবাভাগে খাদ্য পানীয়ের তৃপ্তি উপভোগ করিয়া ও অধমর্ণদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আনন্দে কাল কাটাইতেন। মর্ম্মরগৃহের বিলাস বাসন, নদীতীরের শীতল মলয় বা উদ্যানবাটিকার পুষ্পসৌরভ, সকলই তাঁহার সমান উপভোগ্য ছিল। যথেষ্ট গর্ব্ব ছিল তাঁর আপন পুত্রকলত্র সম্বন্ধে, আপন গৃহস্থালী সম্বন্ধে, জনগণের নিকট আপন মান-সম্ভ্রম সম্বন্ধে। পরম সুখেই ছিলেন তিনি, যেমন আরো অনেকেই থাকে। কিন্তু এক অদৃশ্য হস্ত তাঁহার জীবনধনুর জ্যা ধরিয়া টানিতেছিল; সত্যের বাণ যোজনা করিয়া ছাড়িবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল ঐ ধনুকাষ্ঠ ও রজ্জু তাহার বেগ ধারণের উপযুক্ত কি না। এইরূপে আরো দশ বৎসর কাটিয়া গেল মিশরের নানাবিধ জ্ঞান সঞ্চয়ের নীরব সাধনায় ও স্ফুটনোন্মুখ হৃদয়-মনের অশান্ত বেদনায়; দেউল উঠিবার প্রারম্ভে স্থাপিত হয় ভিত্তি, এবং বাণী ফুটিবার পূর্ব্বাহ্নে হয় চিন্তাধারার উৎপত্তি। অতঃপর তিনি একদিন দেশস্থ ধর্ম্ম-যাজকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ওরে নির্ব্বোধের দল! রৌদ্রের প্রাখর্য্য দেখিয়া মূর্খ লোকেরাই সূর্য্যের দিকে দুই হাত তুলিয়া তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যই ঈশ্বর নহে। ঈশ্বরকে কেহই দেখিতে পায় না। ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য। তিনি কেবল মাত্র অনুভূতির দ্বারাই গ্রাহ্য। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার কোনো পুত্র-কলত্র নাই।" এই সংবাদ শুনিয়া ফারাও ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বৃষরাজ যেমন অযথা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সে বলিল—"কাহার এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমার বিনা অনুমতিতে নূতন

ধর্ম্মবিশ্বাস লইয়া এ রাজ্যে প্রাণ ধারণ করে? তাহার হস্তে হীরকাঙ্গুরীয়ও নাই, কণ্ঠে মণি-মুক্তার কণ্ঠনরও নাই। আমারই সে দাস মাত্র; ভীষণ শাস্তি তাহাকে সংগোষ্ঠি গ্রহণ করিতে হইবে। আমি বিদ্যুতের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বজ্রের মত তাহাকে দগ্ধ করিব।" কিন্তু বন্ধুর পার্শ্বত্যাগপথে উঠিতে হইলে পথিক যেরূপ ভাবে বলসঞ্চয় করিয়া লয়, মহাপুরুষ সেইরূপে বলসঞ্চয় করিয়া নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত চিত্তে আপন নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন।

মৃগনাভি উত্তমরূপে চূর্ণিত করিতে হয়, ধূপে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়,—তবেই উহার সৌরভ উত্থিত হইয়া থাকে। শুক্তাবেষী যদি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশকালে শ্বাসরোধের আশঙ্কা করে তবে সে একটিও শুক্তা আহরণ করিতে পারে না। দেউল গঠনে যখন প্রয়োজন হইল সর্ব্বাপেক্ষা গুরুভার প্রস্তরখানি উঠাইবার এবং সাবধানে তাহা বহন করিয়া আনিবার, তখন কক্ষে বেদনা লাগা সত্ত্বেও মহাপুরুষ তাহা প্রাণপণে তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর চল্লিশ বৎসর যাবৎ সেই মরুভূমি প্রদেশে উহা তিনি অত্যন্ত আয়াসের সহিত সানন্দে বহন করিয়া চলিলেন—কেবল এই জ্ঞানে যে তিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছেন, ফারাওয়ের আদেশ নহে। অবশেষে দেউলরচয়িতার নির্দ্দেশিত স্থানে আনিয়া উহা যথারীতি সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত করিলেন এবং ভার নামাইয়া কপোলের স্বেদবারি মোচন করিলেন; দুর্ব্বলতায় তাঁহার হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল, স্কন্ধে পীড়া অনুভব হইল।

অতঃপর তাঁহার মৃত্যুর সময় আগত হইল।

ঈশ্বরকে তিনি জানিয়াছেন অকৃত্রিমরূপে। তাঁহার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে যে প্রস্তর বা ধাতু বা মৃত্তিকা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিমা গড়িতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। হীরুজাতিকে মোহমুক্ত করিবার ভার বিধাতা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন,—মোহজাল তিনি ছিন্ন করিয়া দিলেন, দারুণ স্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। উত্তপ্ত ক্ষুধার্ত্ত মরুপ্রদেশে এক দুর্ব্বল ও দুর্ভিক্ষীত সম্প্রদায়ের নায়ক রূপে রাখিয়া বিধাতা চল্লিশ বৎসর কাল তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। চল্লিশ বৎসর কাল তিনি রাজার ন্যায় অক্ষুণ্ণ প্রতাপে বাস করিলেন; অগণ্য সম্বতি-বেষ্টিত শ্রম-জীবীর ন্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেন; দারিদ্র্য সম্বল করিলেন মেষপালকের মত; মল্লযোদ্ধার ন্যায় রহিলেন উন্নতশির, সিংহের ন্যায় অমিততেজা। কটিদেশে মৃগচর্ম্ম মাত্র আচ্ছাদিত তাঁহার অনাবৃত দেহ রৌদ্রবৃষ্টিতে মলিন হইল, পদযুগল উষ্ট্রপদের মত কঠিন ও শুষ্ক হইল। বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে সকলেই মনে করিত ইনি মানুষ নহেন, সকলেই তাঁহাকে দেবতার মত সম্ভ্রম করিত। কিন্তু একদিন অবশেষে তাঁহারও অন্তিমকাল উপস্থিত হইল।

শোনো শোনো, সকলে মন দিয়া শোনো। শাস্ত্রে লিখিত আছে:—"সকলেই জন্মায় সত্যের ক্রোড়ে,—পরে পিতামাতাই করিয়া দেয় হীরু, বা ক্রীশ্চান, বা অগ্নি-উপাসক।"

কিন্তু মহাত্মাপুরুষ থাকে অন্ধের মত; পদে পদে সে পথ হাৎড়ায় যতক্ষণে ঠিক পথটি না চিনিতে পারে; ঊর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া একমনে আলোকের উৎসধারার অনুসন্ধান করে। জীবনের সম্বন্ধেও সে বিবেচনা করে, মৃত্যুর সম্বন্ধেও বিবেচনা করে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভের দ্বারা আপন মৃত্যুভয় দূর করে। সংসারে এমন লোক নিতান্ত অল্প নাই যাহারা অবশ্য-গ্রাহ্য মৃত্যুর পানীয় অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করে: কেহ কেহ এমন কথাও বলে—"জীবনের পানীয়রসের মতই ইহা মধুর।" তথাপি যে জীবনকালেই মৃত্যুর পানপাত্র কামনা করে সে মূর্খ ও ঘৃণার্হ। এবং সেও মূর্খ যে মৃত্যুর কথা একবারও না ভাবে, যে ভুলিয়া যায় এই নশ্বর মানবের প্রেমাস্পদ কেবল একটিমাত্র, যিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি ও অবিচল রাজভক্তি যাঁহার প্রাপ্য। শোনো শোনো, সকলে মন দিয়া শোনো,—মানুষের কথা মানুষের যেমন করিয়া শোনা উচিত তেমনি করিয়া শোনো এবং মনে মনে বিচার কর। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা পূর্ব্ববর্ত্তীদের অসামান্য বাণীর সহিত নিজেদের সামান্য কিছু বাক্য মিশাইয়া বলিতেছি,—এবং যে বিষয়ে বলিতেছি তাহা কাহারও অজ্ঞাত নয়; আমাদের বক্তব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য সকলকে সান্ত্বনাদান।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—"আমি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, তোমাদের শরীরে যে ধমনীস্রোত বহিতেছে আমি তাহা অপেক্ষাও তোমাদের নিকটতম।" করুণাময় তিনি। জানেন তিনি আমাদের পক্ষে কি ভাল আর কি মন্দ। তিনিই গড়িয়াছেন আমাদের নশ্বর করিয়া, তবু মৃত্যুকে আমরা নিবারণ করিতে চাই। কী ভ্রান্তি! শুনিয়াছ কি ইস্রাদ্দার কত আয়াসে নরকদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল? সে শুনিয়াছিল নরকদ্বারে অমৃত সুধা আছে, তবু সে তাহা পান করিতে পারিল না। পশ্চাত্তাড়নায় কোন বিধবার প্রদীপশিখাটি নিভিয়া যাইবে বলিয়া পবন-দেবতা কর্ত্তব্য পালনে বিচলিত হন না। মৃত্যু-দূত দরিদ্র মেষপালকের কাতর প্রার্থনাও গ্রাহ্য করে না, রাজরাজেশ্বরের তীব্র অনুযোগও না। কিছুকাল অপেক্ষা কর: জন্মনাকল্পনাপূর্ণ তোমার অস্থি-কোটরস্থ ঐ মস্তিষ্ক একদিন ধরিত্রী গ্রাস করিয়া লইবে। মৃত্যু ও লোভী নয়, তুমিও আবু-বাকর নহ: স্বর্ণ বিনিময়ে তুমি মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি পাইবে না। অতএব, সান্ত্বনারই অনুসন্ধান কর।"

মরুপ্রদেশে থাকিয়া অবশেষে অন্তিমকালে মহাপুরুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেইজন্য শাস্তিস্বরূপ তাঁহার স্বর্গারোহণের পথ অবরুদ্ধ হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে প্রাণী মাত্রেই নশ্বর এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং মৃত্যু তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী। বলিলেন তিনি—"মৃত্যুকেও আমি জয় করিব।" একদিন দ্বিপ্রহরে মোয়াব পর্ব্বতের উপর হীরুপল্লীর মধ্যে যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন পর্ব্বতের শ্বেত প্রস্তরের উপর তাঁহার ছায়াপাত হয় না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির

উপক্রম ঘটিল। আহত জন্তু যেমন আততায়ীর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ দ্রুত গতিতে তিনি আপন মণ্ডপে ফিরিয়া গেলেন। কটিদেশে বাঁধিয়া লইলেন এক তরবারি এবং আদেশ দিলেন প্রচুর খাদ্য পানীয় আনয়ন করিতে। আকণ্ঠ ভরিয়া তিনি সেই সকল খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিলেন। ইহাতে তাঁহার এমন বমনোদ্বেগ ও কুক্ষিপীড়া উপস্থিত হইল যেন বোধ হইল তিনি কোনো হলাহল পান করিয়াছেন অথবা নরকস্থ বৃক্ষের কোনো বিষময় ফল ভক্ষণ করিয়াছেন; তাঁহার মুখচোখ সবুজ হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, আসন্ন-প্রসবা রমণীর ন্যায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন —"দেখ দেখ, আমার মৃত্যু উপস্থিত,—সকলে তরবারি উন্মোচন করিয়া আমাকে রক্ষা কর!" প্রথম দিনে তিনি এইভাবেই কেবল চীৎকার করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় দিনে তাঁহার যন্ত্রণা আরো বাড়িল, কাতর হইয়া বলিলেন—"আমার জন্য বৈদ্য ডাকিয়া আন!" বৈদ্য আসিয়া যখন বলিল যে সে কিছুই করিতে পারে না, এবং তৃতীয় দিনেও যন্ত্রণার উপশম হইল না, তখন তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন—"দয়া কর, দয়া কর! মৃত্যু অজেয় তাহা স্বীকার করিতেছি!" অতঃপর শ্রান্ত হইয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, এবং সমস্ত দিন নিদ্রার পর তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব হইল। নিদ্রাভঙ্গে সুস্থ হইয়া দেখিলেন রাত্রি হইয়াছে এবং তিনি একাকী গৃহমধ্যে পড়িয়া আছেন; পুনরায় তিনি বাঁচিয়া থাকার অভিলাষ করিলেন, জীবন ত্যাগ করিতে মায়া হইতে লাগিল। তখন দুইজন কৃষ্ণকায় দূত আসিয়া উপস্থিত হইল তাঁহাকে মুক্তি ও সান্ত্বনার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য।

একজন বসিল মহাপুরুষের মাথার নিকট, একজন বসিল তাঁহার পদতলে। তাহারা বলিল—"কথা কও!" কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, আপন চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। উহাদের আগমনে ভীত হইয়া তিনি বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সত্য তাঁহার অন্তরে তখনও সম্পূর্ণ প্রবেশ করে নাই। চারিদিক নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন, অন্ধকারে বাতাসের শব্দটুকু পর্য্যন্ত শোনা যায়। গুমোটভরা অন্ধকার রাত্রি,—তারাগুলি উজ্জ্বল, নিশ্চল।

"ভগবানের দয়া সর্ব্ব জীবের প্রতি"—মাথার নিকটের দূত কহিল।

পদতলে উপবিষ্ট দূত কহিল—"কিন্তু দেখ এই ব্যক্তি যন্ত্রনায় কাতর; ইহার মৃত্যুযন্ত্রন হইতেছে, এইবার মরিবে!"

মহাপুরুষ বুঝিলেন ইহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে। তিনি মনে মনে উত্তর করিলেন:

"ইহা তো মৃত্যু নয়, পীড়া মাত্র,—শাস্তি স্বরূপ। এই কথাই ঠিক। কারণ মৃত্যুকে যে অনুভব করিয়াছে তাহার আর সে কথা বলিবার উপায় থাকে না। কেহই জানে না উহা কিরূপ।"

"সূর্য্যের আলোকই জীবনের মূল"—মাথার নিকটের দূত কহিল।

"কিন্তু তাহা জীবকে দগ্ধও করে"—পদতলে উপবিষ্ট দূত তাহার উত্তর করিল।

মহাপুরুষ বুঝিলেন উহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে। তিনি মনে মনে উত্তর করিলেন:

"ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার উদ্দেশ্যও মঙ্গল। এই কথাই বোধ হয় ঠিক। মৃত্যুর তুলাদণ্ডে একদিন সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ওজন করা হইবে এই কথা স্মরণ করিয়া মানুষ যেন তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত নিয়োজিত করে, এবং অবশেষে যেন নির্ভয়ে অন্তিমকালের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে। কোনোরূপ তুলাদণ্ড যদি না থাকে তবে বিক্রেতা কিরূপে বুঝিবে যে ক্রেতার সহিত ন্যায্য আদান প্রদান হইতেছে বা তাহাকে উচিত মূল্যের দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে? আর এক কথা, সূর্য্য কখন অস্ত যাইবে সেই ভয়ে কেহ যদি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকে কিরূপে তাহা নিবৃত্ত করা যায়, তবে উহার দিন কাটিবে কিরূপে? অবিলম্বে সে উন্মাদ হইয়া যাইবে।"

"মৃত্যুর নিদ্রা বড় সুমধুর"—মাথার নিকটের দূত কহিল।

পদতলে উপবিষ্ট দূত কহিল—"কিন্তু ঐ দেখ, হীরপত্নীতে এই মাত্র একটি বালক মরিল,—জীবিতকালে সর্ব্বদা সে আনন্দে থাকিত, সকলেরই সে প্রিয়পাত্র ছিল। ঐ শোনো—উত্তপ্ত বাতাসের স্বনন ধ্বনি শোনা যায়, তারকা মণ্ডলী উদ্দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে; শৃগাল ও নেকড়েবাঘের দল মৃতদেহের আঘ্রাণ পাইয়া কবর খুঁড়িয়া উহা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সদ্য উহার স্বাদ গ্রহণ করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া আনন্দে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ের ব্যথা ঐ সমাধি অপেক্ষাও অতি গভীর।"

তাহারা মহাপুরুষকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল এবং এই শেষোক্ত কথায় তাঁহাকে আহত করিল। কিন্তু মনে মনে তিনি এই উত্তর করিলেন:

"গতজীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত আমি স্মরণ করিতেছি; আমার বাল্যকালের সুমধুর স্বপ্ন, আমার যৌবনের আনন্দ, প্রাপ্তবয়সের কর্ম্ম-কুশলতা,—সমস্তই স্মরণ করিয়া আমার কষ্ট হইতেছে। তোমরা কবরের কথা বলিতেছ,—শুনিয়া ভয়ে আমার হৃত্পদ হিম হইয়া যাইতেছে। তোমরা আর আমাকে অযথা সান্ত্বনা দিও না, কারণ তাহাতে সাহস কমিয়া যায় আর আমাকে দেহের কথা স্মরণ করাইয়া দিও না, কারণ তাহাতে মোহ উপস্থিত হয় অন্যরূপ ভাবে এ বিষয় চিন্তা করাই কি উচিৎ নয়? যে উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া পথিক একদিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করে, তাহা পরিত্যাগ করিতেও উহার মায়া হয়: তথাপি

যাহার অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, সে কর্ত্তব্যবোধে অগ্রসর হইয়াই চলে। কবরের ভয় পাইয়া আমরা আদিযুগের বর্ব্বরদিগের মতই আচরণ করি,—যাহারা ঈশ্বরকেও জানিত না, আত্মার অবিনশ্বরতাও জানিত না, কেবল নিজের বর্ত্তমান অস্তিত্বটুকুই বুঝিয়াছিল। ঈশ্বরের বিরাট সৃষ্টি-বিধান যে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, মৃত্যুকে তাহার ভয় করা উচিত নয়। আপন মনকে এই বলিয়া বুঝাও যে মৃত্যুকে আমরা যত ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করি উহা বাস্তবিক তত ভয়ঙ্কর নয়। তাহা যদি হইত তবে এই বিশ্ব সংসারও এতদিন টি কিত না, মানুষও এতদিন টি কিত না।"

"সাধু ব্যক্তি এ,"—মাথার নিকটের দূত কহিল।

পদতলে উপবিষ্ট দূত বলিল—"কিন্তু এ অবাধ্য হইয়াছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিল। সেই জন্য ইহাকে শাস্তি লইতে হইবে, মোয়াব পর্ব্বতে ইহার কবরের কোনো চিহ্ন থাকিবে না। ইহার সমস্ত কীর্ত্তি লুপ্ত হইবে।"

মহাপুরুষ বুঝিলেন ইহারা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছে। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন :

"যাহার কৃত কার্য্যের যেরূপ মূল্য তাহার কীর্ত্তি সেই মতই স্থায়ী হইবে। যাহা ক্ষণভঙ্গুর তাহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। অশেষ কীর্ত্তিমান পুরুষও কখন উচিতমূল্যের অধিক প্রত্যাশা করে না।" এই কথা শুনিয়া দূত যুগল মুগ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল :

"ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে অভয় দিবেন! আমরা তোমার নিকট মাথা নত করিতেছি!"

তাহারা অন্ধকারের মূর্ত্তিতে উহার তাবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কেবল তাহাদের চক্ষুগুলি তারকার মত জ্বলিতেছিল। রাত্রের অন্ধকারের মধ্যে তাহারা মিলাইয়া গেল। মহাপুরুষ সেই মরুভূমিতে একাকী তাঁহার তাঁবুর মধ্যে ভূমিশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। পর্ব্বতের অন্তরাল হইতে যখন সূর্য্যোদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁবু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল তখন তিনি ঐ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া শীতল ছায়ার অন্বেষণে ধীরে ধীরে পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে কোনোস্থানে ছায়া পাইলেন না। ঘূরিতে ঘূরিতে ক্রমে পর্ব্বতের অন্তরে এক লুকাইত স্থানে আসিয়া একটি গুহা দেখিতে পাইলেন। নিকটে গিয়া দেখিলেন দুইজন বন্দী তীক্ষ্ণধার গাঁইতির দ্বারা পাথর কাটিয়া ঐ গুহার মুখ পরিষ্কার করিতেছে। এখানকার পাথর পর্ব্বতশৃঙ্গের তুষারের মত শুভ্র, রৌদ্রতেজে তাহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বন্দীদ্বয়ের তাম্রবর্ণ দেহ, কৃষ্ণবর্ণ কেশ আর পরিধেয় কটিবাস ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গিয়াছে। গুহার অভ্যন্তরে ছায়াস্নিগ্ধ শীতলতা, এবং উহার সান্নিধ্যে একটি প্রস্তরের পর দুইটি সুপক্ক আপেল ফল রক্ষিত। বন্দীরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র গাঁইতি রাখিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল :

"আসুন প্রভু, জগদীশ্বরের নাম লইয়া আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। আমাদের কার্য্য এইবার শেষ হইল।"

মহাপুরুষ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কে, এবং এখানে কি করিতেছিলে?"

তাহারা বলিল :

"আমরা রাজার রত্নাগার প্রস্তুত করিতেছিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখুন আর এই স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। ফল দুইটি খাইয়া আপনার তৃষ্ণা দূর করুন,—পরীক্ষা করিয়া ব ইহার মধ্যে কোনটি অধিক মিষ্ট।"

মহাপুরুষ তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার গাত্র-সন্নিধ্যে একটি প্রস্তরাসনে উপবেশ করিলেন, এবং শীতল ছায়া পাইয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। অতঃপর প্রথম ফল খাইয়া বলিলেন :

"আহা, ইহা জীবন-রসে পরিপূর্ণ : স্নিগ্ধ প্রস্রবন-জলের ন্যায় ইহা আমার তৃষ্ণা দূ করিল, উন্মুক্ত প্রান্তরের পুষ্পসৌরভ ইহার মধ্যে পাইতেছি, এবং সহস্রক্ষরিত মধুর আস্ব অনুভব করিতেছি। খাইবামাত্র আমি সুস্থ হইলাম, সবল হইলাম।"

তৎপরে দ্বিতীয় ফলটি খাইয়া বলিলেন :

"আহা, ইহার কোনো তুলনা নাই : আমি স্বর্গীয় সুধা পান করিলাম, ইহাতে মৃগনাভি অপূর্ব্ব সৌরভ ; মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় ইহা আমার অনন্ত কালের তৃষ্ণা দূর করিল, আ অনন্তের সমীপবর্ত্তী হইলাম। স্বর্গের মলয়সৌরভ আমি পাইতেছি, পারিজাত পুষ্পে মধু আস্বাদ করিতেছি,—ইহাতে কটুতার লেশমাত্র নাই। স্বর্গীয় এক তন্দ্রার ঘো আমি আচ্ছন্ন হইয়াছি। এইখানে আমি শয়ন করিলাম ; যতক্ষণ এই পরিতৃপ্তির ঘোর কাটে ততক্ষণ আমাকে কেহ জাগাইও না।"

বন্দীগণ—তাহারা ভগবানেরই দূত—তখন ধীরে ধীরে আপন আপন বাণী উচ্চারণ করিল

প্রথম বন্দী বলিল—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য না ডুবিয়া যায়, নক্ষত্ররাজি নভঃস্থল হইতে ঝরিয়া না পড়ে, গিরিরাজি স্বস্থান-চ্যুত না হয়, উষ্ট্রীনীকুল পরিত্যক্ত না হয়, সমুদ্র অগ্নি না হয়....."

দ্বিতীয় বন্দী শেষমন্ত্র উচ্চারণ করিল—"শান্তি, শান্তি! বিশ্ব বিধাতার জয় হউক সকলেই এইরূপে তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবে!....."

মহাপুরুষ ইহাদের কথা অস্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন সেই স্থানে শয়ন করিয়া আপন অজ্ঞাতসারে মৃত্যুনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বন্দীরা গুহা মুখ বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এইরূপে মহাপুরু নিজ কাল পূর্ণ করিয়া আপনার স্বজনবান্ধবের নিকট গিয়া মিলিত হইলেন, মৃত্যু কি তা আর অনুভব করিলেন না। মোয়াব পর্ব্বতের কোন স্থানে তাঁহার কবর লুকাইত আছে পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান কেহই জানে না। কিন্তু তাঁহার উপদেশবাণী আজও মানবের হৃদ মুদ্রিত হইয়া আছে এবং ভিন্নগ্রন্থের গর্ভে সমস্তই লিপিবদ্ধ করা আছে।

শেখ সাদি,—তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক, তাঁহার অমূল্য মুক্তারাজি সংগ্রহ করিয়া আমাদের মুক্তার সহিত পাশাপাশি গাঁথিয়া এই বিচিত্র মাল্য রচিত হইল,—কবি সাদি বলিয়াছিলেন একব্যক্তির কথা যে এককালে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয়ের আস্বাদ পাইয়াছিল। এই ব্যক্তি অনেক কাল ধ্যানে মগ্ন হইয়া কাটাইল; যখন সে সংসারে ফিরিয়া আসিল তখন সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া প্রশ্ন করিল—"কৈ হে, তোমার ভাবোদ্যান হইতে কি পুষ্পরাজি চয়ন করিয়া আনিলে?" তখন সেই ব্যক্তি উত্তর করিল—"ভাই, মনে করিয়াছিলাম তোমাদের জন্য আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়া আনিব; কিন্তু গোলাপের ডাল ধরিয়া যেমন টানিলাম অমনি উহার গন্ধে এমন মাতোয়ারা হইলাম যে ডালটি হাত হইতে অন্যমনস্কে ছাড়িয়া দিতে হইল।"

যিনি পারেন, তিনি কবির এই গল্পটির সহিত আমাদের গল্পের কি যোগ আছে তাহা বুঝিয়া লউন। পৃথ্বীতলে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদের শান্তি ও আনন্দ লাভ হউক!

(ইভান বুনিনের 'Death' নামক গল্প হইতে)

যুগোত্তরা

—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

একমাত্র সত্য সখি—মানুষ বাঁচে না চিরদিন।
মৃত্যুর মমতা
আকর্ষিছে বিশ্ব আত্মা; দুর্নিবার এই আকর্ষণ
রোধে, কারো নাহিক' ক্ষমতা!
একমাত্র সত্য সখি—মানুষ বাঁচে না চিরদিন;
মৃত্যুর মহিমা—
বিশ্ব অন্তরালে রহি বিকশিছে অসীমের মাঝে
একমাত্র গম্ভীর গরিমা!

চমকি উঠো না সখি—মৃত্যু যদি জননীর মতো
মোরে কোলে নিয়া
পরম স্নেহের ভরে গাহে সেই শান্তি-সুপ্তি-ভরা
টানাসুরে ঘুম-পাড়ানিয়া!
রণক্ষেত্র হয় যদি আমার আত্মার রক্ত-রাগে
সিক্ত ও রঙিন,
ক্রন্দন কোরো না সখি; শুধু জেনো সত্য কথা এই,—
মানুষ বাঁচে না চিরদিন!

তোমার বাহুর মালা আমার এ কণ্ঠ হ'তে সখি
নাও খুলে নাও,—
পথের দামামা-ধ্বনি ডাক দেয় আত্মারে আমার
বন্ধহীন মুক্তি এবে দাও!

যুগোত্তরা

অমন ব্যাকুল ক্লান্ত করুণ মিনতি-ভরা চোখে
চেয়ো নাকো আর,—
বিদায়-সুরের মাঝে গেয়ো না গেয়ো না সখি আর
আবাহনী, দুরন্ত দুর্ব্বার !

তোমার অলক গন্ধ, তোমার ওষ্ঠের মোহখানি,
বক্ষ প্রলোভন—
দুরন্ত যৌবনদৃপ্ত অন্নতৃপ্ত আত্মারে আমার
করিতেছে স্তব্ধ অচেতন !
বাসনা জাগিছে তোরে নিবিড় করিয়া ধরি বুকে
নিত্য গাহি গান,—
ভুলে যাই বিশ্ব, আর ভুলে যাই বিশ্ব-মানুষের
ব্যগ্র আর্ত্ত বেদনা-আহ্বান !

তবু আজ যেতে হবে ; দুর্ণিবার রণ-আকর্ষণ
ডাকে মৃত্যু সম :
চকিতে ক্ষণিকে তাই রবি-তেজে অন্ধকার মতো
বাসনার মোহ-ঘোর মম—
কোথায় অনন্ত ক্রোড়ে কোন অন্ধ বিবরের বুকে
মিলো বা আশ্রয় !
তোমার অলক গন্ধ, তোমার অক্ষির মদিরতা
বুঝ সখি মানে পরাজয় !

মুছে ফেল বারি, মোর বক্ষ হ'তে তোলো তব মুখ,
আজি নিজ করে
আমারে সাজায়ে দাও বীরোচিত সৈনিকের সাজে,
দাও ভরি পাথেয় সম্ভারে।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

কর্ম্মের দামামা-ধ্বনি ঐ শোনো ডাকে পুনর্ব্বার,—
দাও ছেড়ে দাও,—
উন্মাদ যাত্রার ক্ষণে কাঁদি বৃথা হায় উন্মাদিনী
কেন মিছা করুণা জাগাও !

থাক্ থাক্ প্রিয়তমা - থাক্ আজ সে সকল কথা
তুলো না, তুলো না—
সে স্মৃতির সুধা-স্বপ্ন পরে ভেবো—যত পার ভেবো
বিরহের দিনে তা ভুলো না।
কবে কোন জোৎস্নারাতে মিলনের মধু পূর্ণিমায়
বুকে ধরি তোমা—
গেয়েছি প্রেমের গীতি, করেছি প্রেমের খেলা কত
মনে রেখো, ভেবে দেখো রমা।

কবে সেই মল্লীঘেরা বল্লরীর কুঞ্জের বিতানে
লুকাইয়া রহি—
আমারে উন্মাদ সম ঘুরায়েছ তব অন্বেষণে
প্রেমময়ি, হে কৌতুকময়ি !
কবে আমি তব সনে অকারণে বিবাদ করিয়া
ক্রোধে চিত্ত ভরি
কেঁদেছি কুঞ্জের তলে একান্তে বসিয়া অবিরত
মিলিব না কভু পণ করি !

তারপরে অকস্মাৎ তুমি সখি জানি না কখন
আসিয়া পশ্চাতে—
আমার নয়ন দুটি আচ্ছাদিলে পরম কৌতুকে
সুকোমল দুটি ক্ষুদ্র হাতে।

'যাও তুমি সরে যাও'—হয় তো বা বলিয়া থাকিব
অভিমান করি,—
যেই তুমি বাথাভরে নিম্নপানে নামাইলে মুখ
গুষ্ঠে তব দিনু চুমা ভরি।

না, না—আর যাব নাকো! বাহিরে দামামা বেজে বেজে
যাক্ থেমে যাক্,—
অসহায় মানুষের বাথাপূর্ণ বেদনা বিলাপ
শূন্য সম শূন্যেতে মিলাক!
থাকো তুমি থাকো প্রিয়া এই রূপে জড়ায়ে আমায়,—
লতিকার মতো,—
অন্যায়ের হোক জয়, ক্ষতি নাই আসুক প্রলয়,
তোমারে না করিব আহত!

ক্লিষ্ট মানুষের বক্ষে বিদ্ধ হোক অন্যায়ের শর,—
তীব্র হাহাকার
ভেদ করি দিকে দিকে হোক নির্ঘোষিত নিত্য নব
অসত্যের উল্লাস হুঙ্কার!
অগ্নিবাণে অত্যাচারে দগ্ধ হোক, জর্জ্জরিত হোক
বহিরঙ্গচয়,—
অনঙ্গের কুঞ্জে মোরা অন্তরঙ্গে রহি দোঁহে মিলি
আধো জাগা আধো তন্দ্রাময়!

এস তবে···ওকি প্রিয়া, অকস্মাৎ একি মূর্ত্তি তব
সৌদামিনী সমা?
নয়নে অগ্নির দীপ্তি জাগে কেন, কোথা গেল তব
অধরের করুণ সুষমা?

অকস্মাৎ এ কি খেলা,—আমারে সমর সাজে সখি
সাজাও বা কেন?—
একি লীলা লীলাময়ী, ভীম বজ্র করিছ বাহির
মৃদু পুষ্প-বক্ষ হ'তে হেন!

তবে কি, তবে কি আহা—প্রিয়তমা, ধন্য হনু আমি,
ধন্য এই বক্ষ পাশে এমন তোমারে পেয়েছিনু
সুমধুরা,-তবে চলিলেম?
তবে চলিলেম সখি, এর পর ক্ষোভ কিছু নাই,
সত্য তোরে কহি,—
ক্ষোভহীন, লোভহীন, প্রেমে মোরে করিলি অমৃত
মৃত্যুহীনা হে রহস্যময়ি!

* * * *

ক্ষমা দাও মোরে প্রিয়া, ক্ষণতরে এসেছি ফিরিয়া
শুধু দিতে,—নিতে
একটি নিভৃত চুমা,—ক্লান্তি হরি' নিয়ে যাবে মোরে
মৃত্যুপার অমৃত-অতীতে!
ও কি ও পথের বেশ, একি হেরি রহস্য মূরতি?
হায় সহনারী,—
চোখে শ্রুশ্রু, হস্ত অসি, মুহূর্ত্তে সেজেছ আজি সখি
অদ্বিতীয়া বামা শুভঙ্করী!

এই হো, এই তো আহা—প্রিয়তমা, ধন্য, ধন্য আমি,
ধন্য ভালোবাসা,—
ক্ষোভহীন, লোভহীন, দ্বিধাহীন এই তব প্রেম
মৃত্যুভয় নাশা!
প্রান্তরের তূর্য্যধ্বনি ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে যায়
এসো তবে যাই—
জীবনের প্রেমগানি মরণের হিম বক্ষ'পরে
এসো দোঁহে উল্লাসে বিছাই!

ভিখারী

—শ্রীদুর্গা দেবী

অতি তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে এই এক অতি সামান্য গল্প। কিন্তু এত সূক্ষ্ম এর মর্ম্ম যে ভয় হয় বুঝি হরফ্ দিয়ে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে গেলেই এর আসল সৌন্দর্য্যটুকু নষ্ট হ'য়ে যাবে, এর মৃদু সৌরভটুকু আর থাকবে না। কেন জানি না,—এই গল্পের যিনি নায়িকা তাঁর নিজের মুখের মধুর ভাষায় যখন প্রথম এটা শুনি,—এক উৎসব সন্ধ্যায়, প্যারিস সহরের কোনো হালফ্যাশানের বিলাসী ভোজগৃহের পরিবেষ্টনের মধ্যে,—তখন এ গল্প আমাদের মনে এমন গভীর ভাবে গাঁথা হ'য়ে গেল যে তারপর থেকে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান হ'লেই আমরা প্রসঙ্গক্রমে এইগল্পের উল্লেখ করতাম; ক্রমে মুখে মুখে এ গল্প অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রচারিত হ'য়ে গেল,—অনেকেই এই জানা গল্পের পুনরোক্তি করতো এবং সকলেই তা খুসী হ'য়ে শুনতো। কেন জানি না,—হয় তো সে সময় আমরা তরল হাস্যকৌতুকের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে ছিলাম,—হঠাৎ এই কাহিনী এক উজ্জ্বল রশ্মিরেখার মত তার মধ্যে প'ড়ে আমাদের চেতনাকে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল; রূপের মাধুর্য্য যেমন চকিতে একটিমাত্র আকস্মিক ভঙ্গিমার দ্বারা কখনো কখনো সমস্তটাই ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে, তেমনি হয়তো সে সময় গুটিকতক আন্তরিক সরলোক্তিতে এক অকলঙ্ক হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ আমাদের কাছে একেবারে সমস্তটাই উদ্ঘাটিত হ'তে দেখেছিলাম।

সে দিন আমরা এই কথা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে মানুষের মনে এক রকম অদ্ভুত দুর্ব্বল প্রবৃত্তি আছে যার থেকে কেউই প্রায় নিষ্কৃতি পায় না,—মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান তাকে শ্রেণীভুক্ত ক'রে কি একটা নাম দিয়েছে। এই বিচিত্র প্রবৃত্তির তাড়নায় কেউ বা অকারণে হঠাৎ গুণতে সুরু করে একটা নির্দ্দিষ্ট ঘরের মধ্যে কতগুলো কড়ি বরগা আছে, কেউ বা গোণে আলমারীতে কতগুলো বই আছে,—এমনি কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে চোখের সাম্‌নে গোণবার উপযুক্ত কিছু দেখলেই সে অকারণে গুণতে সুরু ক'রে দেয়। এই প্রবৃত্তি অনুসারেই এক একজন পথ চলতে চলতে হঠাৎ মনে মনে সঙ্কল্প করে যে পিছনে যে গাড়ীখানা আসছে সেটা ছাড়িয়ে যাবার আগে তাকে ঐ সাম্‌নের ল্যাম্প-পোষ্টটা ছুঁতেই হবে—কিংবা তখন যদি একটা ঘড়ি বাজতে আরম্ভ করেছে তো সেই বাজাটা শেষ হবার আগে তার ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছনো চাই। এই দুর্ব্বলতাটুকুর জন্যেই কেউ কেউ ঘুমোতে যাবার আগে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি স্থান প্রত্যহ একবার

ঘুরে দেখে আসে, কিংবা কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট জিনিষ নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করে, কিংবা কোনো একটা ছবির দিকে চেয়ে অথবা একটা কোনো বাক্স খুলে একবার দেখে নেয়। এই সব হচ্ছে আধুনিক মানুষের ছোটখাটো মস্তিষ্ক-বিকৃতি,—উন্মাদের এই সব বীজ আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে জন্মপরম্পরা পেয়ে থাকি, এবং ক্রমে ক্রমে এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের অংশের সামিল হ'য়ে যায়।

আমরা নিজেদের মধ্যে এই সব দুর্ব্বলতা আর অন্ধ বিশ্বাসের কথাই পরস্পর বলাবলি করছিলাম,—আর যখন দেখছিলাম যে সকলেরই এই রকম মুদ্রা দোষ আছে, এমন কি আপন দোষটার চেয়ে পরের দোষটা আরো হাস্যকর বলে যখন মনে হচ্ছিল, তখন মনে মনে বেশ আমোদ পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন তরুণী, শুধু তিনিই কিছু বললেন না। সুন্দর মুখখানিতে অল্প একটু বিস্ময়ের হাসি নিয়ে চুপ ক'রে বসে আমাদের কথা শুনতে লাগলেন। একজন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে:—

"আচ্ছা আপনি,—আপনি কি আধুনিক কালের এই সব দুর্ব্বলতা থেকে একেবারে মুক্ত? এ ধরণের কোনো রকম বদ অভ্যাস কি আপনার নেই?"

তরুণী যেন নিজের মনের ভেতরটা বেশ ক'রে একবার খুঁজে দেখে নিলেন। তারপর বললেন—"না!" ঘাড় নেড়ে আর একবার জোর ক'রে বললেন "না!"

আমরা সকলেই বুঝলাম তিনি সত্য বলছেন, কারণ তাঁর যেমন কথাবার্ত্তা আর ব্যবহার দেখলাম, যেমন সুনাম আছে শুনেছিলাম, তাতে সহজেই মনে হয় যে আমাদের দলের সামাজিক জীবদের চেয়ে তাঁর স্থান একটু উঁচুতে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে বোধহয় একটু কুণ্ঠা উপস্থিত হোলো, সকলেই দুর্ব্বলতা স্বীকার করছে আর তিনি যেন একেবারে স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকবেন এটা যেন তাঁর ভাল ঠেকলো না। কথাটা বদলে নিয়ে তিনি বললেন—

"সত্যই রাস্তার গাড়ী দেখে দেখে গোণা কিংবা শুতে যাবার আগে বাক্স খুলে দেখার কোনো রকম বদ অভ্যাস আমার নেই। কিন্তু দিনকতক আগেই আমার এমন একটা নতুন অভিজ্ঞতা ঘটেছে যেটা বোধ হয় আপনারা যে রকম মনোভাবের কথা বলছেন সেই ধরণেরই হবে।—কতকটা যেন ভিতরকার একটা প্রেরণার মত। সেদিন সামান্য ব্যাপারে অতি তুচ্ছ একটা কাজ করবার জন্যে এমন একটা কড়া তাগিদ মনের মধ্যে জোর করতে লাগলো যেন সেটা একেবারে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা।"

ব্যাপারটা আমরা শুনতে আগ্রহ করলে তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন। এই সামান্য কথায় এতগুলি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে যেন কুণ্ঠিত হয়েছেন এইরকম ভাবে ভারী নম্র ও মৃদু কথায় গল্পটি বললেন:—

দুর্গা দেবী

"ঘটনাটা যা হ'য়েছিল তা সংক্ষেপেই বলি। এই পাঁচ ছয় দিন আগে আমার মেয়ে সুজনকে নিয়ে একবার রাস্তায় বেরিয়ে ছিলাম। জানেন তো তার বয়েস বছর আষ্টেক হবে। তার ক্লাসে তাকে 'লেক্‌চার শুনবার' জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম,—তিনি এর মধ্যেই বড় হ'য়ে উঠেছেন কি না, তাই ক্লাসে যাওয়া বললে আর চলবে না, বলা চাই লেক্‌চার শুনতে যাচ্ছি। দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিল তাই ভাবলাম পথটা হেঁটেই যাই। আমরা দুজনে খুব গল্প করতে করতে যাচ্ছি এমন সময় খোঁড়া ভিখিরি একটি ছেলে পা টেনে টেনে আমাদের সুমুখে এসে কোনো কথা না ব'লে হাত পেতে দাঁড়ালো। আমার তখন হাত জোড়া; একহাতে আমার ছাতা ধরেছি আর একহাতে মেয়ের হাত ধরেছি, তার জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে যে আবার মণিব্যাগ খুলে পয়সা বের কংতে হবে, এতটা করতে আমার ইচ্ছে হোলো না; তাকে কিছু ভিক্ষে না দিয়ে আমি বরাবর এগিয়ে চলে গেলাম।

"সুজন আর আমি শ্যাম্প্‌স্ এলিসেইস্ ধরে বরাবর চল্‌লাম। মেয়েটা তারপর থেকেই হঠাৎ কথা কওয়া বন্ধ ক'রে দিলে, আমিও কেন জানি না বলবার আর যেন কোনো কথাই পেলাম না। ঐ ভিখিরি আসার পর থেকে দুজনেই চুপচাপ চলতে চলতে এক রাস্তা পার হ'য়ে আর এক রাস্তায় এসে পড়লাম। তখন থেকে একটু একটু করে আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো, যেন ভয়ানক কি একটা অন্যায় কাজ করেছি, যেন তার জন্যে একটা ভয়ানক আসন্ন বিপদে আমায় পড়তে হবে। যখনই আমার কোনো কিছুতে সন্দেহ হয় তখনই সেটাকে খুঁটিয়ে বিচার করা আমার অভ্যাস, তাই পথ দিয়ে যেতে যেতে আমার মনের মধ্যে খুঁজে দেখতে চেষ্টা করলাম কি দোষ করেছি।

"নিজের মনেই বললাম—ভিক্ষে দিই নি বলে এমন কিছু মহা দোষ করা হয়নি। যাকেই দেখবো তাকেই যে ভিক্ষে দিতে হবে এমন কিছু মানে নেই। যাই হোক এর পর কোনো ভিখিরীকে আর ফেরাবো না, তা হলেই তো হোলো!"

"কিন্তু কোনো যুক্তিতেই মনে শান্তি এলো না, মনের অস্বস্তি বাড়তে লাগলো, শেষকালে কেমন একটা যন্ত্রণা হতে লাগলো। অনেকবার মনে হোলো ছেলেটাকে যেখানে দেখেছিলাম সেখানে আবার ফিরে যাই, কিন্তু মেয়ের সামনে তা করতেও আবার লজ্জা হতে লাগলো। কে কি ভাব্‌বে তাই মনে করে আমরা উচিত কাজটা করতেও ইতস্ততঃ করি, এমনি অধঃপতন আমাদের হয়েছে।

"আমরা প্রায় গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে পৌছেচি এমন সময় সুজন আমার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে—"মা!"

"কি রে?"

ভিখারী

"আমার মুখের দিকে বড় বড় করে চেয়ে গম্ভীর হয়ে যে বললে—মা, তুমি ঐ ছেলেটাকে কিছু দিলে না কেন?

"সেও তা হ'লে আমার মত ঐ এক কথাই এক্ষণ ভাবছিল; আমার মত তারও মনে একটা ব্যথা লেগেছিল; কিন্তু মায়ের চেয়ে তার মনটা বেশী সরল আর বেশী খাঁটি বলে সে সোজাসুজি কথাটা বলে ফেল্‌লে।

"আমি আর একটুও ইতস্ততঃ করলাম না। বললাম—ঠিক বলেছিস্—কিছু দিয়ে আসি চল্।

"আমরা একটু তাড়াতাড়ি গিয়েছিলাম, ওদের সেই লেক্‌চার বসবার তখনো ২০ মিনিট বাকী ছিল। একটা ভাড়াগাড়ী রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে তাকে বলে দিলাম খুব জোরে চালিয়ে শ্যাম্প্‌স্ এলিসেইস্ যেতে,—তা হলে সে বক্‌শিশ পাবে। আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে বসে রইলাম, দুজনেই মনে একটা উদ্বিগ্ন ভাব। খোঁড়া ছেলেটা যদি চলে গিয়ে থাকে? ফিরে গিয়ে যদি তাকে খুঁজে না পাই?

"নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌছে আমরা তাড়াতাড়ি নেবে চারিদিক খুঁজতে লাগলাম। ছেলেটার চিহ্ন মাত্র নেই। একটা মেয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে চেয়ার বিক্রি করছিল, তাকে ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বল্‌লে তাকে সে আজ দেখেছে বটে, কিন্তু রোজ সে এখানে আসে না। কোন দিকে যে গেল তাও সে বলতে পারে না। আমাদের তখন সময়ও আর বেশী নেই, হতাশ হয়ে আমরা তাকে পাবার আশা ছেড়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছি—এমন সময় সুজন হঠাৎ তাকে দেখতে পেলে, একটি গাছ তলায় বসে হাঁটুতে মাথা রেখে ছেলেটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে, মাথার টুপি খুলে পায়ের মধ্যে গুঁজে রেখেছে। সুজন পা টিপে টিপে তার কাছে গিয়ে একটা টাকা তার টুপির মধ্যে ফেলে দিলে; তারপর আমরা ফিরে চলে গেলাম। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আমরা দুজনেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম,—যেন হঠাৎ কত বড় একটা বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার হয়ে এলাম।"

গল্প শেষ করে তরুণী যখন ক্ষান্ত হলেন তখন দেখলাম লজ্জায় তাঁর মুখ চোখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে। আমরাও তন্ময় হ'য়ে শুনছিলাম—সে সময় স্পষ্ট অনুভব করছিলেম যেন একটু নির্ম্মল বায়ুর আঘাণ পাচ্ছি, যেন অনাবিল জলের উৎস ধারার মুখে এসে কিছু সুমিষ্ট তৃপ্তিবারি পান করছি।

(Marcel Prevost এর "The Beggar Child" হইতে।)

ভারতে লিপি প্রচলন

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লৌকিক অর্থে যে ভাষায় লোকে সচরাচর কথাবার্ত্তা কহে, নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করে যে ভাষা ইতর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে। লৌকিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলন হইয়াছে দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা তখন সাধারণ লোকের ভাব প্রকাশ করিবার উপযোগী ছিল না তাহা নয়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বা পুস্তকাদি লিখনে ব্যবহার হইত। পরবর্ত্তী যুগে যে সময়ে আমরা মহাকবি কালিদাস ভবভূতি আদির নাটক দেখিতে পাই তখনও দেখি যে সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃত নামে আর কতকগুলি ভাষা তাহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই ভাষাগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোকেরা ব্যবহার করিতেছে কিন্তু সকলেই সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারিতেছে। এই প্রাকৃত ভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন কিন্তু ইহাতে কতকগুলি নূতন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে তিন রকম "শ" বা দুই রকম "ন" সর্ব্বত্র প্রযুক্ত নাই। ভাষার শব্দগুলি উচ্চারণের সৌকার্য্যানুসারে নূতন নূতন আকার লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত বৃক্ষশব্দ প্রাকৃতে রুক্ষ হইয়াছে সংস্কৃত দুস্তর শব্দ ও প্রাকৃতে দুত্তর হইয়াছে ইত্যাদি। এইরূপ চলিত ভাষার পরিবর্ত্তন প্রতিতই হইয়া থাকে। ব্যাকরণ হিসাবে কোথায়ও ভাষা তৈয়ারী হয় না। অন্যান্য ভাষা হইতেও চলিত ভাষায় অনেক শব্দ আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষায় পারসি আরবি উর্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে অনেক শব্দ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এমন কি মাত্র দেড়শত বৎসরের পরিচিত ইংরাজী ভাষা হইতে ও অনেক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে সেগুলিকে ভাষা হইতে পৃথক করা যায় না। "ডবল" পয়সা ইতর সাধারণ সকলেই বুঝে। ডবল শব্দটী ইংরাজী ভাষার শব্দ উহার প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় "দ্বিগুন" কিন্তু ডবল পয়সার স্থলে দ্বিগুন পয়সা বলিলে লোকে বাতুল বলিবে। গ্লাস শব্দটী ইংরাজী glass কথা কিন্তু এখন সকলেই এক "গ্লাস" জল চাহে। এই সকল দেখিয়া বুঝা যায় যে চলিত ভাষা অর্থাৎ যে ভাষায় লোকে কথাবার্ত্তা কহে সে ভাষা ব্যাকরণের আইন সর্ব্বসময়ে মানে না।

সংস্কৃত যখন চলিত ভাষা ছিল তখন উহারও অবস্থা ঐরূপ ছিল। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি (derivation) মিলেনা আবার অনেক শব্দ উনাদি প্রত্যয় দ্বারা কোন রকমে সিদ্ধ করিতে হইয়াছে। সংস্কৃত জামিত্র কেন্দ্র প্রভৃতি শব্দ গ্রীক diametre, centre প্রভৃতি শব্দ হইতে ভাষান্তরিত। উহাদের সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায় না।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে ব্যাকরণের আইন কানুন দেখিয়া ভাষা সৃষ্টি হয় না বরং ভাষার তারতম্য অনুসারে ব্যাকরণ রচিত হয় পানিনির ব্যাকরণে আরও একটী ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় তাঁহার সূত্রগুলির মধ্যে মধ্যে লেখা আছে "ইতি ভাষায়াং" "ছন্দসি" সেগুলির অর্থ "লৌকিক ভাষায় এইরূপ চলে" "বৈদিক ভাষার নিয়ম এই"। ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে তিনি যে কালে ব্যাকরণ রচনা করেন সে সময়ে বৈদিক ভাষাও কিছু কিছু লোকের বোধগম্য হইত। তিনি লৌকিক ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন কিন্তু বৈদিক ভাষার সহিত উক্ত লৌকিক ভাষার যে যে স্থলে সামঞ্জস্য নাই সেগুলিও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইলে বৈদিক ভাষা তাঁহার পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং সে ভাষারও ব্যাকরণ আদি ছিল। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পানিনির ব্যাকরণে যে বর্ণমালার পরিচয় পাই, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সংস্কৃত ভাষা সে বর্ণমালা দেখিয়া রচিত হইতে পারে না। তাহার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে যদি বর্ণমালা রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হয় যে বৈদিক ভাষা রচিত হইবার তিনশত বৎসরের মধ্যে ঐ ভাষাটী নষ্ট হইয়া লৌকিক সংস্কৃত ভাষা রচিত হইয়াছিল। ভাষার জীবন মরণ এত শীঘ্র হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। বেদের ঋকগুলির ভাষা যজুর্ব্বেদের যজ্ঞ বিধানের ভাষা উপনিষদ্ গুলির ভাষা একত্র করিয়া পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান তিনশত বৎসর মাত্র হইতে পারে না এবং শত দিয়া তাহা নির্ণয় হয় না হাজার দিয়া নির্ণয় করিতে হয়। বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণমালা ব্যবহার হইত লৌকিক সংস্কৃতে ও সেই বর্ণমালাই ব্যবহার হইয়া ছিল উহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে পাণিণি স্বয়ং বলিতেছেন এই সূত্রগুলি অর্থাৎ এই বর্ণমালাটী আমার নিজের নয় ইহা মহেশ্বর নামক বৈয়াকরণ পণ্ডিতের রচিত। সুতরাং পাণিণির ব্যাকরণে যে বর্ণমালা পাওয়া যায় তাহা খৃঃপূঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

যদি বলেন যে বর্ণমালা সৃষ্টি হইয়াছিল বটে কিন্তু বর্ণমালার হরপগুলি তোমরা জানিতে না উহা খৃঃপূঃ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। সে কথার জবাব এই যে উহা আমাদের ঠিক ধারণায় আসে না আমরা ৪৬টী বর্ণমালার অক্ষর সব জানিতাম কিন্তু সেগুলি কিরূপে লিখিতে হয় তাহা আমরা জানিতাম না। ক এই ব্যঞ্জন বর্ণের পর স্বরবর্ণের আকার যোগ করিলে উহার আকারগত বৈলক্ষণ্য হয় অর্থাৎ ক + আ = কা হয় ক + ই = কি হয় এসব আমরা

জানিতাম কিন্তু কিরূপে ঐগুলি লিখিত হয় তাহা জানিতাম না। কিরূপে কবে জানিলাম তাহার প্রমাণ এক্ষণে ইউরোপ মহাদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে যথা—

"Dr. Buhler has shown that this writing (the Brahmi script) is based on the oldest Northern Semitic or Phonoecian type represented on Assyrian weights and on the Moabite stone which dates from about 890 B.C. It was introduced about 800 B.C. into India by traders coming by way of Mesopotamia".

"A considerable length of time was needed to elaborate from the 22 borrowed semitic symbols the full Brahmi alphabet of 46 letters. This complete alphabet was worked out by learned Brahmans on phonetic principles.

বিমনা সাঁঝে

—শ্রীশচীন্দ্র বসু

যাক, সব শেষ হয়ে গেছে, সমস্ত কিছুর অবসান। আমি ফিরে এলাম, আমার ঘরের মধ্যে—আমার সত্তার মধ্যে। জগতের আর সব কিছু হয়ে আসছে অন্ধকার, শুধু আমি ফুটে উঠছি নিজের মাঝে আমার আপন আলোতে।—'এক্স্-রের মত সে আলো, তাকে কেউ দেখতে পারে না—কিন্তু সে ফুটিয়ে তুলছে আমার গভীর অন্তঃস্তল।

কি আশ্চর্য্য, এখনও আমার কবিত্ব করতে ইচ্ছে করেছে! আমার নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমার ইচ্ছে করছে কথার পর কথার সুসামঞ্জস্য দিয়ে আমার চিন্তাগুলির অনুধাবন করতে! তবে কেন আমি কবিতা লিখছি না? না, না, দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে চল্‌বে না, এই মুহূর্ত্তে তুচ্ছ ভাব প্রবণতা ভরা একটা কবিতা লেখার অদ্ভুত প্রবৃত্তি যেন আমার না হয়।

আমি কবি, আমি সাহিত্যিক। বেশী লোকে না হলেও কেউ কেউ আমার সে পরিচয় জানে। আমি যে গল্প লিখি তা কয়েকজনের আনন্দের বস্তু। আমার লেখা পড়ে তারা সবাই বলে, তোমার লেখায় প্রাণ আছে। কিন্তু প্রশংসাই যে তারা শুধু করে তা নয়। তাদের খুঁৎ খুঁজে বের করার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে আমি চমৎকৃত না হয়ে পারিনে।

আমার প্রধান দোষ, তারা বলে, আমি নাকি আমায় নিজস্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি কৃত্রিম ছবি আঁকতে গিয়ে। অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কার করে বল্‌লে কথাটার মানে হবে এই যে আমি শুধু আঁকতে যাই বাংলা দেশের পালিশ করা রঙচঙে সমাজকে, যার বিষয় এর আগে অনেক কিছু লেখা হয়ে গেছে। আধুনিক সাহিত্যিকদের যে কোনো একটা বই খুললেই নাকি রুজ আর এসেন্সের বিলিতি গন্ধ ভুরভুর করে ওঠে,—বাংলাদেশের সাধারণ পাঠক সমাজ নাকি তাক্ত হয়ে উঠেছে সেই বিষময় বিদেশী বাষ্পে। কিন্তু কয়েকজন তথাকথিত সাহিত্যিক—তার মধ্যে নিশ্চয়ই আমি অন্যতম—নাকি দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তন করার কোনো চেষ্টা না করে উল্টো ঐ সব বিলিতি আমদানী করে দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি। সুতরাং, সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি ভাল সাহিত্যিক নই,—আমার নিজের কোনো রং নেই, কোনো কল্পনা নেই, সৃষ্টি নেই। এই সব হচ্ছে তাদের বক্তব্য, তা না বল্‌লেও আমি বুঝতে পারি। মেয়েদের নাকি এমন এক রহস্যময় দৃষ্টিশক্তি আছে যাতে হাঁ করলে তারা মনের কথা বুঝে

নিতে পারে, তার জন্যে সাইকোলজি পড়তে হয় না,—আমারও সেরকম একটা বিস্ময়কর কৃতিত্ব আছে যাতে আমার সাহিত্য এবং চরিত্র সম্বন্ধে কেউ কোনো কথা বলবার উদ্যোগ করলেই আমি তার বক্তব্যটা বুঝে নিতে পারি।

আমার কথা ভেবে আমার শুভানুধ্যায়ীরা হতাশ হয়েছেন। আমার যৌবনে এই যে অধঃপতনের বীজ রোপিত হোলো তা নাকি পরিণত বয়সে বিষবৃক্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। এখনও যদি চেষ্টা করি তবে নাকি আমি লেখার মোড় ঘোরাতে পারি।

এই গেল আমার সাহিত্যসৃষ্টির দিক। আমার চরিত্রও কিন্তু তাদের কাছে গোপন নয়। মানুষের মুখ যেমন মনের আয়না তেমনি আমার লেখাতে নাকি আমার পরিপূর্ণ ছায়া পড়ে একথা তারা বিশ্বাস করে। আমার লেখায় দুটি বিভিন্ন চরিত্র যদি তাদের নিজ নিজ মতামত নিয়ে কোনো বিষয়ে তর্ক করে তবে তার মধ্যে যে মতটা আমার বন্ধুদের অপছন্দ হবে সেটা তারা নিঃসন্দেহে আমার বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। আমার নায়ক যদি প্রেম করে তবে তাদের কাছে প্রমাণিত হোলো যে আমি নিজেকে নিয়ে গল্পটা লিখেছি।

তাদের কথার আমি প্রতিবাদ করি,—করি এজন্যে নয় যে তারা আমার প্রতি অবিচার করেছে বলে আমি মর্মাহত হয়েছি, করি শুধু মজা পাই বলে। আধুনিক সাহিত্যের অধোগতি সম্বন্ধে তারা যখন ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন সুতীক্ষ্ণ তর্ক আর সুউচ্চ কণ্ঠস্বরের সাহায্যে আমি তাদের উড়িয়ে দিই। এসব শুনে তারা যখন আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে বেশ মজা পাই তখন তাদের দেখে। বলি, আমরা ভবিষ্যতের অগ্রদূত, আমরা ছুটে চলেছি সামনে যেখানে আছে নতুন প্রাণ, নতুন সৃষ্টি —বলি, জগৎটা অত্যন্ত অলস আর গতানুগতিক, সে আমাদের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না, তাই আমরা বর্তমানের আগে এগিয়ে গেছি, ভাবীকালের বুকে আমাদের পদচিহ্ন পড়েছে ; সে চিহ্ন একদিন পরবর্তী কালে আবিষ্কার হবেই, সেদিন হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু থাকবে আমাদের বাণী।—ওরা উষ্ণতর হয়। এবার সাহিত্য ছেড়ে চরিত্রে কটাক্ষ ক'রে, বলে অকমনীয় অহমিকা, অসহ্য আত্মম্ভরীতা। কিন্তু সেখানেও আমি ওদের আমল দিই না, বলি নিজেকে বড় করে না দেখলে জগতের কোনো বড় জিনিষকে দেখা যায় না। আমি বুঝতে পারি আমার মাঝে আছে জাগ্রত প্রতিভা, অসাধারণ বুদ্ধি,—তাকে যদি আমি উপযুক্ত সম্মান না দিই তবে সে প্রতিভার অনাদর হ'বে।

এমনি ভাবে আমি বড় বড় ভাবে তাদের কাছে বলি, তারা মনে করে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তারা জানে না কোথায় আমার 'নিজ', আর কোথায় বা আমার 'প্রতিষ্ঠা'। আমার বাক্য আর ব্যবহারের অন্তরালে কি যে আমার প্রকৃত প্রকৃতি তা আমি কাউকে জানতে দিইনি। কিন্তু আজ, আজ আবার কেন ওল্টাচ্ছি মনের পাতা, কেন করছি নিজেকে উদ্ঘাটন ? আর যদি লিখলামই তবে কেন কবিতা লিখলাম না ? তার কারণ আমার

এ লেখার অনুভূতি কবিতার ভাবের সীমা লঙ্ঘন করেছে। ছন্দের নাগপাশে একে আবদ্ধ করবার না আছে আমার ঔদ্ধত্য, না আছে প্রবৃত্তি।

আজ আমায় বলতে দাও আমি কি, আমার সত্তাকে আজ আমায় প্রচার করতে দাও। আমি মানুষ বটে, কিন্তু লোকে আমায় যা ভাবে সে মানুষ আমি নই।—আমি গল্প লিখি, কিন্তু আমার গল্পই আমি নয়। আমি একটি অবাস্তব আত্মস্তাবক, কিন্তু সেইটুকুই আমার পরম পরিচয় নয়। আমার আর স্বতন্ত্র প্রকারের অস্তিত্ব আছে—যেখানে শুধু আমাকে নিয়ে আমি প্রীত এবং পরিতৃপ্ত, যেখানে আমি সম্পূর্ণ গোপন এবং আপন। আমার অজ্ঞাত দুর্গ একাকীত্বের রহস্য অন্ধকারে আবৃত, সেখানে নেই আর কারো স্থান। সেখানে আমি পেতাম আমাকে, আমার মৃত্যুহীন আত্মাকে। জীবনে আমি কোনোদিন চাইনি কারো সাহায্য, কারো সাহচর্য,—আমার ছিল সে একাকীত্বের অখণ্ড সম্পদ। কি আসে যায়, কে আমার লেখা পড়ে' কি মন্তব্য করে সে খোঁজে! দিনের কোলাহলের পর যেমন আসে ঘুমের তন্দ্রাময়ী রাত, তেমনি তর্ক আর আলোচনার আবিলতার পর আমার মনকে আমি আচ্ছন্ন হতে দিতাম চিন্তাগাঢ় নিঃসঙ্গতায়।

জীবনে আমি কাউকে ভালোবাসতে পারিনি, চেষ্টাও করে দেখিনি কোনোদিন। এমন কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আবিষ্কার করতে পারিনি যার জন্য সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হ'য়ে ওঠে, যে না থাকলে আকাশ গোষ্পদে সঙ্কুচিত হয়, জীবন হয় অর্থহীন দুর্বহ একটা বোঝা। না, এখন পর্যন্ত তেমন কেউ সন্ধ্যা তারা হয়ে ফোটেনি আমার মনের আকাশে ; কিন্তু আমিও তো কোনোদিন মনে মনে কামনা করিনি কোনো মনসীকে! আমার অন্তর্নিহিত ভালোবাসা প্রবাহিত হয়েছে অন্যদিকে,—পরকে ভালো না বেসে আমি বেসেছি আপন আত্মাকে, মানুষকে না বেসে বেসেছি আইডিয়াকে। সুন্দরের স্পর্শের জন্য কোনোদিন লালায়িত হইনি কল্পনার কল্পলোকে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। আর্টকে নিয়ে আমি নিজেকে সৃষ্টি করবো প্রতিটি পরিপূর্ণ মুহূর্তে, এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। আমার আত্মার গহন অরণ্যে আমি ছিলাম নির্জন সাধক।

লোকে আমাকে ভুল করতো। আমি যে এত নিরপেক্ষ, এত নিশ্চিন্তরূপে উদাসীন হতে পারি এ তারা বিশ্বাস করতে পারে না। সামান্য একটা বাদবাদ-আইডিয়াকে ভালোবেসে বেঁচে থাকবার মত নির্লিপ্ত যে আমি নই, এ তারা ধরে নিয়েছে! কিন্তু কেবল দেখে শুনেই আমি আনন্দ পাই, পরম পরিতৃপ্ত হই। ইন্দ্রিয়ের এই পরিতৃপ্তিটুকুই যে আমি সব চেয়ে বেশ ভালোবাসি, তার বেশী যে আর কিছু চাইনে, একথা বোঝাই কি করে? সেটুকুই যে আমার আর্টের পক্ষে যথেষ্ট, ঐ হিউমার বোধটুকুই যে আমার সব, এর চেয়ে সত্য আর কি আছে?

তাই রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে আমি খুঁজে পাই নিজেকে। প্রতিদিন আমার মধ্যে আমি

বিমনা সাঁঝে

আমার স্তব্ধ ঘরে যখন জমে আসে ম্লান বিষণ্ণ অন্ধকার, তখন রাতের সেই মন্থর মুহূর্তগুলিতে আমি করি সে রহস্যের উন্মোচন। সে আনন্দ অনির্বচনীয়,—তুচ্ছ, তুচ্ছ তার কাছে প্রাত্যহিক পৃথিবীর পঙ্কিল কৃত্রিমতা। কেন আমি এর বেশী চাইবো? কি আমার বাকি থাকে চাইবার যদি আমি পাই নিজেকে?

তাই এতদিন কারো জন্য প্রতীক্ষা করবার আমার দরকার পড়েনি; আমি নিজেকে নিয়ে চলেছিলাম নব নব সৃষ্টির ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণতার দিকে। কিন্তু মাঝখানে এলো বাধা, আমার সুন্দরের সাধনায় এলো ব্যাঘাৎ। কোনোদিন আমার জীবনকে আমার আর্টের সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিনি, জানতাম আমার সব কিছু ভাল মন্দ আছে আর্টের মধ্যে! কিন্তু আমাকে জানতে হোলো যে আমার নিজস্বটুকু এমন জায়গায় আছে যেখানে আর্ট থেকে আমি বিচ্ছিন্ন।

কথার ফেনায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কবিত্ব করে বলতে আর ইচ্ছে করছে না।—সংক্ষেপে বলি। আমার আত্মসমাহিত অবস্থায় একদিন বাধা এলো। সে একটি মেয়ে। কি বলে তাকে আমি বোঝাবো। আমার মনে হচ্ছে তার সম্বন্ধে কিছু না বলাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। কথার উজ্জ্বলতায় তার সৌন্দর্য্য লজ্জা পাবে। আমার গল্পের নায়িকা সে নয়, তার না আছে মোটার গাড়ী, না আছে ব্যারিষ্টার বাবা। সাধারণতায় অসাধারণ কায়াহীন একটা আবছায়া। তাকে তুলনা কোরোনা চাঁদ বা আকাশের উজ্জ্বল তারাটির সঙ্গে। সে হচ্ছে সেই তারাটি যাকে নগ্ন চোখে দেখা যায় না,—অনেক, অনেক দূরে সবার পেছনে যে নিজের অস্তিত্ব গোপন করছে। তাকে দেখা যায় না, আবিষ্কার করতে হয়।

তার নাম ছিল, ধরা যাক অনু। তার দেহের বর্ণনা দিতে আমার কলম সরছে না, কিন্তু তবু একটুখানি না দিয়ে আমি পারছিনে। তার রং ফর্সা নয় শ্যামলতায় সুনীল। তার সমস্ত অবয়বে যতটুকু মাংস দরকার ঠিক ততটুকু,—একটু বেশী কম নয়; দেখলেই বোঝা যায় আধুনিকতার অত্যুগ্র সাধনায় উন্নীর্ণ হবার জন্য সে উপবাসের সাহায্যে ভৌতিকর বিশীর্ণতার সৃষ্টি করেনি। তার চোখে নেই দীপ্তি, নেই প্রাণ্যথ্য, আছে অমলিন শ্যামলিমা, মধ্যরাত্রের আকাশের মত তা রহস্যময়।

তারপর আমার রোমান্স। হায়, আমারো রোমান্সের কথা কোনোদিন কাগজে কলমে লিখতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। তাও এমন বিচিত্র, না আছে ঘটনা, না রোমান্স। ওর সঙ্গে আমি বেশী কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না, বলে থাকলেও যা বলেছি তা আমাদের আত্মাবলোপী স্তব্ধতায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওর দিকে না তাকিয়েও আমি অনুভব করতাম ও ওর উচোখ ভরে অন্ধকারের আড়ালে আমার দিকে চেয়ে আছে। ওর সে দৃষ্টি ধৃষ্টতায় উদ্ধত নয়, শান্ত আন্তরিকতায় আনম্র।

ব্যাস, এই পর্য্যন্ত,—আমার রোমান্সের আর কোনো খীঁ ল্ নেই। তবু এর থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে আমি ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তবে ঠিক যথাযথ সুনীতি হবে না।

শচীন্দ্র বসু

কারণ ওকে পাবার আকাঙ্ক্ষা আমি পাইনি, দেখার আগ্রহও যে খুব বেশী ছিল তাও বলা যায় না। তবে ওকে যখন দেখতাম তখন আমার ভালো লাগতো যেমন ভালো লাগে নির্জন সন্ধ্যায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ ছোট একটি অজানা বন্য ফুলের গন্ধ।

তখনও আমার আত্মার মাঝে আমি মগ্ন, ধ্যানের তন্দ্রায় আমি নিদ্রিত। এর মাঝে অণু অসুখে পড়লো। হায়, যদি তা না হোতো তবে আজ এসব কথা আমায় বোলতে হোত না। আমি থাকতে পারতাম আমাকে নিয়ে, আমার চেতনা থাকতো অন্তর্মুখী।

অণু অসুখে পড়লো। দিনে দিনে শয্যার কোণে পড়েও ক্ষয় পেতে লাগলো বিশীর্ণ একটি শীতের ফুলের মত। ওর দেহ শুখিয়ে যেতে লাগলো, ওর শ্যামলিমা ম্লান হোলো কুৎসিৎ কৃষ্ণতায়। চোখের কোণে পড়লো ভাঁজ, গালে এলো বিবর্ণতা। সুন্দরের এই অবমাননায় জগতের কার কি লাভ?

অসুখের সময় কখনো কখনো আমি ওর পাশে বসে থেকেছি। স্তব্ধ, রূপকথার অট্টালিকার মত নীরব ধূসর সেই ঘর। বিলীয়মান একটা ছায়ার মত সাদা বিছানার ওপর শায়িত অণুর দিকে চেয়ে ম্লান বিবর্ণ সন্ধ্যায় আমি অনেকদিন বসে থেকেছি। ঘরে হয়তো কেউ ছিল না। কিন্তু তবু কেউ কোনো কথা বলিনি। মুহূর্তগুলি হতাশায় মন্থর হয়ে একে একে পার হ'য়ে গেছে। ওকি বোলতে চেয়েছিল তা কি আমি বুঝতে পারিনি? এর চেয়ে সহজ, এর চেয়ে স্পষ্ট আর কি আছে? রোগবিশীর্ণ ওর দেহের মাঝে ওর আত্মা অপবিত্র হয়নি, সে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো বাঁধার নীরবতায়, প্রতিধ্বনি আমি শুনেছি।

শুধু যে শুনেছিলাম তা নয়, এখনও তেমনি স্পষ্ট, তেমনি সহজ ভাবে আমি শুনতে পাচ্ছি। অণুর পার্থিব অস্তিত্বের প্রমাণটুকু আজ সংকার করে এলাম। জগতে কোনো জিনিষই নষ্ট হয় না,—না বস্তু, না শক্তি। ওর দেহও নষ্ট হয়নি, শুধু রূপান্তরিত হয়েছে আর ওর আত্মা এখনও ঘিরে রয়েছে আমাকে!

আজ আমি কি করে বোঝাবো কি আমি বোলতে চাই,—কেউ কি তা বুঝবে! আমি ওকে ভালোবেসেছি কিনা সে তর্কে প্রয়োজন নেই, আমি শুধু ওর দিকেই তাকিয়ে আছি। ও মুখফুটে কোনোদিন কিছু বলেনি, হয়তো চেয়েছিলো বোলতে, পারেনি। কিন্তু ও যদি জেনে যেতে পারতো ওর সব বলা কওয়া আমি বুঝতে পেরেছি,—শুধু যদি ও জেনে যেতে পারতো যে সমস্ত ব্যর্থতার মধ্যেও ও ব্যর্থ হয়নি! নুতার যুথোমুখি দাঁড়িয়েও ও ছিল স্তব্ধ, চিরদিনের মত নির্বাক। নিবারণ ব্যর্থতাকে সযত্নে ও বরণ করে নিয়েছে।

কিন্তু তবু, জগতে ট্রাজিডির মত সুন্দর আর কি কিছু আছে? ব্যর্থতার মত বরণীয়, শূন্যতার মত সম্পদ আর কি আছে? ও ঝরে গেল, অন্ধকারের আড়ালে অজানা ফুলের মত, কিন্তু যেটুকু ওর গন্ধ, যা কিছু সৌন্দর্য্য তা কোনোদিন লুপ্ত হবে না আমার কাছে।

বিমনা সাঁঝে

কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত, বিষণ্ণ ব্যস্ততার পর আমি আজ ফিরে এলাম। মৃত্যুর স্পর্শ এখনও আমার অঙ্গে, তার গন্ধ এখনও পাচ্ছি। মৃত্যু,—কথাটা কত সহজে উচ্চারণ কোরলাম, অথচ কি তার অর্থ? পরজন্মের কথার আস্থা নেই, আকাশে তারা হয়ে ফুটে ওঠার গল্প শুনলে হাসতে ইচ্ছে করে না। সমস্ত প্রলম্বিত জীবনটার এমন একটা অতর্কিত অর্থহীন সমাপ্তির মত অসুন্দর আর কি আছে? জীবনটা কি শুধু একটা গভীর স্বপ্নের পর হঠাৎ ঘুম থেকে ওঠা? রাতে দেখা আর ভোরে ভুলে যাওয়া মিথ্যা একটা স্বপ্ন ছাড়া কি এ আর কিছুই নয়? তবে কেন, কেন অকারণ এর অস্তিত্ব, এতে কার কি লাভ? যদি বলো বিধাতার অভিরুচি, তার লীলারহস্য বোছবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানুষের নেই, তবে স্তব্ধ হও। তোমাদের ওই দুর্বল ক্ষীণ সহানুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই। ও শুধু অক্ষরের একটা ক্ষমাহীন হীনতা,—ওর মত ফাঁকি আর কিছু নেই।

মনে হয় বিধাতা যেন সৃষ্টির মাঝখানে এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে থেকেছেন। মনে হয় তার তুচ্ছ, অকারণ খেয়ালের ফলে এই সৃষ্টির পরিকল্পনা, কিন্তু এর কোনো সুসঙ্গত সমাপ্তি আগে যেন তিনি ভেবে রাখেননি। তাই মাঝখানে হঠাৎ এনে দিলেন মৃত্যুর গহ্বর,—নিজের অমিত শান্তির একটা উদ্ধত প্রমাণ! শুধু অকারণ তার খেয়ালের জন্য মানুষকে তিনি দিয়ে গেলেন ব্যথার সীমাহীন সমুদ্র।

কিন্তু কোনো দুঃখ আমার নেই, আমার চারপাশে অনুর আস্থা। সে জানে তাকে আমি কি বোলতে চাই, সে জানে সে ব্যর্থ হয়নি। আমি মিলিয়ে যাবো আমার দৈনন্দিনতায়, আমার কাজে, আমার ব্যস্ততার জগতে। কিন্তু আমি যেখানে নিজের মধ্যে সেখানে সে আছে। চলতে চলতে সীমাহীন পথের কোণে কোনো ম্লান সন্ধ্যায় আমি যদি চোখে তুলে তাকাই, তখন হয়তো দেখবো আকাশের পেলব গায়ে হঠাৎ উঠেছে বিষণ্ণ একটি চাঁদ আমার মত নিঃসঙ্গ;—তখন সেই মুহূর্তেই ওকে মনে কোরবো, সকল বেদনার অতীত সেই অণুকে; সেটুকুই যথেষ্ট,—সেটুকুই আমার পরম পরিতৃপ্তি।

বেঁকী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

— উপন্যাস —

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বেঁকী—!

বাঁকা নদী নয়, বাঁকা চাহনির তন্বী তরুণী নয়, বাঁকা এক ফালি ধানের জমি।

দ্যায়রাক্ হইতে মজিলপুল যাইতে রেলের লাইনটি হঠাৎ ডানদিকে মোড় ফিরিয়াছে সেইখানে লাইনের কোলে নগর পাত্রের বাঁকা সাতবিঘা জমি। রেলের লাইনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার আল বাঁকিয়া গিয়াছে।

নগর অবশ্য কবিত্ব করিয়া বেঁকী নাম রাখে নাই; একটা যাহোক কিছু নাম থাকা প্রয়োজন—

তাই বাঁকা জমি তাহার বেঁকী হইয়া উঠিয়াছে।

বেঁকী আদরের নাম নয়। আদর করিয়া কেহ রাখে নাই।

আদরের হইয়াছে সে নিজের গুণে।

নগর যেখানে সেখানে বেঁকীর বড়াই করিয়া বেড়ায়।

নগরের বড়াই করিবার আর আছেই বা কি!

কিন্তু বড়াই তাহার মিথ্যা নয়—বেঁকীর মত জমি সত্যই দুর্লভ।

ভাদ্রে বর্ষা যখন ধরিয়া আসে,

তখনই রৌদ্র, তখনই বৃষ্টি—

বেঁকীর মাটি দেখা যায় না,

মাটির উপর কচি কচি ধানের গাছ—

রৌদ্রে ঝল্‌মল্ করে,

বাতাসে দোলে,

বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ভিজিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে।

দেখা যায়, বৌকীর সবল সতেজ চারাগুলি আশপাশের সনস্ত জমির গাছগুলিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। মোটা মোটা ধানের গুছি,—গাঢ় সবুজ! তাহার সে নয়ন-ভুলানো রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবারই কথা।

বৌকী বহুরূপী।

সবুজ রং ধীরে ধীরে গাঢ় হয়—

কচি শিষ্‌গুলি মোটা হইতে থাকে,

তাহার পর একদিন প্রভাত-সূর্য্যের কনক-কিরণে তাহার সে সবুজের শীর্ষে কাঁচা সোনার ছাপ লাগে।

সোনামুখী ধানের ফলন যে এত প্রচুর হইতে পারে চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না।

সে ধান কাটিয়া খামারে তুলিতে কালা-ধলাকে লইয়া নগরকে দিনের পর দিন ঘর আর মাঠ করিতে হয়। সাত বিঘা জমির ধানে নগরের খামারে সাতটা পালুই ওঠে।

প্রতিবেশী গোলোকের জমি সাত বিঘার বরং কিছু বেশিই হইবে, কিন্তু তাহার ঘরে ধান-ঝাড়াই শেষ হইয়া যখন ঢেঁকির কাজ সুরু হয়, নগরের তখনও ঝাড়ন চলে।

একা মানুষ। দিনে রাতে তাহাকে সমানে কাজ করিতে হয়। গভীর রাত্রে ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া বৌ তাহার খামারের পাশে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে। কুয়াসাচ্ছন্ন গ্রামের উপর চাঁদের আলো কেমন যেন ঘোলাটে বলিয়া মনে হয়। কন্‌কনে শীতের বাতাসে বৌ একটুখানি কাতর হইয়া পড়ে। গায়ের কাপটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া দেয়ালের কাছে সরিয়া গিয়া বলে, 'আর কেন, এসো এবার!'

নগরের মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, গালের মোটা চাদরটা খুলিয়া বৌএর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ দেয়। তখন তাহার ঘাম ঝরিতেছে।

নূতন পালুইএর আঁটি ভাঙিয়া আবার তাহার ঝাড়ন্ চলিতে থাকে।

নিস্তব্ধ গ্রামের ভিতর সে শব্দ বহুদূর হইতে শোনা যায়।

সবার ঘরেই ধানের কাজ।

ধান সিজাইবার জন্য যাহারা জাগে এ শব্দে ঈর্ষা হয় সকলেরই।

কিন্তু এ শব্দ গোলোকের যেন একেবারে বুকে গিয়া লাগে। মনে হয় এ ঝাড়ন্ যেন তাহার বুকের উপরেই চলিতেছে।

ধান সিজাইবার শুকনো পাতার পাদির কাছে দাঁড়াইয়া গোলক একবার এদিক ওদিক তাকায়, কান খাড়া করিয়া নগরের খামারের দিকে কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পর পালার কাঠিগুলা সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মট্ মট্ করিয়া এমনভাবে ভাঙিতে থাকে যে, মনে হয় পারিলে নগরের ঘাড় সে বুঝি এম্‌নি করিয়াই মট্‌কাইত।

সে অনেকদিনের কথা।

বক্তার নগরের পাঠশালা উঠাইয়া সাতু পণ্ডিত তখন সবে গ্রামে আসিয়া বসিয়াছে। কিন্তু বসিয়া থাকিলে চলে না, তাই সুধনের ঢেঁকিশালের পাশের ঘরে একটা পাঠশালা খুলিতে হইয়াছে।

ছেলেরা সহজে আসিতে চায় না, বর্ষার পরে তাজা ভেরেণ্ডাগাছের কচি পাতা ছিঁড়িলে প্রচুর আঠা বাহির হয়, পাতার ঠোঙায় ধরিয়া ঘাসের নলে ফুঁ দিয়া সে আঠার বেলুন আকাশে উড়াইবার উৎসাহে ছেলেরা তখন মাতিয়া উঠিয়াছে।

পৈরাগ্-পুকুরের চার পাড়েই ভেরেণ্ডা গাছ। ছেলেদের জটলা সেইখানেই বেশি।

নগরের মা সেদিন তাহাকে জোর করিয়া পাঠশালায় পাঠাইয়াছিল। কিন্তু কি একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজনে পাঠশালায় সে বেশিক্ষণ টিঁকিতে পারে নাই। তবে পৈরাগ-পুকুরের পাড়ে বেলুন উড়ানোর প্রয়োজনটাই যে তাহার অপরিহার্য্য, একথা জানিলে সাতু পণ্ডিত কখনই তাহাকে ছাড়িত না।

প্রভাত-সূর্য্যের আলোয় কাঁপা বেলুনের গায়ে বিচিত্রবর্ণের ঝিলিমিলি খেলিতে থাকে নগরের ফুঁয়ের জোরও কম নয়। তাহারই বেলুন হয় সবার চেয়ে বড়, উড়িয়াও যায়—বহু উর্দ্ধে। সেদিনও যাইতেছিল।

পাশের খর্ব্বাকৃতি রোগা ছেলেটির ছোট্ট বেলুনগুলি না হয় বড়—না চায় বেশি দূর উঠিতে। রাগে সে আপন মনেই ফুলিতেছিল।

ছোট একটি বেলুন তাহার অতিকষ্টে হাওয়ার জোরেই বোধকরি খানিকটা উঠিয়াছে, এমন সময় নগরের পাঁচ-পাঁচটা বেলুন তাহাকে ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

নগর মুগ্ধ দৃষ্টিতে উর্দ্ধে বেলুন দেখিতেছিল পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ ঠেলা খাইয়া টাল্ সামলাইতে পারিল না, গড়ানে' পাড়ের উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে পড়িল গিয়া—একেবারে জলে!

সাঁতার সে বেশ ভালই জানিত, কিন্তু আচম্‌কা ঠেলা খাইবার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, পৈরাগ্-পুকুরের শ্যাওলা-ভরা পচা জল তাহাকে সেদিন এক ঢোক্ গিলিয়াই ফেলিতে হইল। তাড়াতাড়ি পাঁড় বাহিয়া যখন সে উপরে উঠিল—শীর্ণ ক্যাক্‌লাসের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া গোলোক তখন মনসা-ঘরের পাশ দিয়া প্রাণপণে দৌড়াইতেছে।

তখন হইতেই বুঝি বিরোধের সূত্রপাত!

সে বিরোধ ক্রমে বাড়িতেই থাকে।

দু'জনেই দু'জনকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়।

নগরের গায়ে জোর বেশি: সে যাহা করে সুমুখেই করে, গোলোক শুধু আড়াল খুঁজিয়া ফেরে। কিন্তু সাপের মত গোপন বলিয়া বিষ তাহার কম নয়।

বেলুন উড়ানোর নেশা নগরের কাটিয়াছে।

এখন সে বোল্‌তা ধরিয়া বেড়ায়। পচুমামা দুদিনের জন্য বোনের বাড়ী আসিয়া তাহাকে এই মজার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়া গেছে।

তবে চাকের বোল্‌তা ধরার চেয়ে যুধিষ্ঠিরের দোকানে ভীমরুল ধরার সুবিধা বেশি। তাহার চিটে গুড়ের মুড়ির লাড্ডুর উপর বোল্‌তা-ভীমরুলের ঝাঁক ক্রমাগতই উড়িতে থাকে।

আধ পয়সার মুড়কি কিনিবার ছুতা করিয়া নগর তাহার দোকান হইতে আর নড়িতে চায় না। খড়ের ভিতর খড় গলাইয়া সে এক অপূর্ব্ব ফাঁস তৈরি করিয়া ভীমরুলের পা আট্‌কাইয়া ধরে। তাহার পর পেট টিপিয়া হুল বাহির করিয়া সাত-আটটা ভীমরুল্‌কে সে সুতায় বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া বেড়ায়।

অন্যান্য ছেলেরা ত' ভয় করেই, কিন্তু গোলোকের জীবন একেবারে দুঃসহ হইয়া ওঠে। বাড়ী হইতে বাহির হইলে তাহার আর নিস্তার নাই!

একটা দিন ত' তাহার মুকুন্দর অন্ধকার গোয়ালেই কাটিয়াছে।

লুকাইয়া একদিন বোল্‌তা ধরিবার চেষ্টা সে নিজেও করিয়াছিল, কিন্তু হুলের যন্ত্রণা, কেঁচোর মাটি লেপিয়াও তাহার তিনদিনে ঠাণ্ডা হয় নাই।

তাহার পর হইতে সে চেষ্টা সে পরিত্যাগ করিয়াছে।

ক্রমশঃ—

উন্মোচনীয়

সিলভার জুবিলি—

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের রাজত্বকাল পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়াতে সম্প্রতি জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হয়ে গেল। এই উৎসবে সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যময় লোকে কত অকাতর অর্থব্যয় করলে, কত আলো জ্বললো, কত বাজি পুড়লো, কত খাওয়া দাওয়া আমোদ-প্রমোদ নাচ গান ক'রে লোকে আনন্দ উপভোগ করলে। তারপর দুদিন বাদেই এই আনন্দের অবসান হবে, সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য আবার গতানুগতিক ভাবে পূর্ব্বমত চলতে থাকবে। জুবিলির কথা দুদিন পরে সকলেই বিস্মৃত হবে।

কয়েকদিন ধ'রে কেবলই আমাদের এই কথা মনে হচ্ছে যে যত কিছু আয়োজন দেখা যাচ্ছে তার সমস্তই অস্থায়ী, সুতরাং এর সার্থকতাও ক্ষণিক; এর চেয়ে যদি কিছু স্থায়ী অনুষ্ঠান কোথাও করা হোতো তা হ'লে সেটা আরো বেশী সার্থক হোতো। আর কোনো দেশের কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের যে এক বিশেষ দৈন্য আছে, এই উৎসবের মধ্যে কেবল সেই কথাটাই আমাদের মনে পড়ছে। মানুষের সব চেয়ে বেশী আনন্দ হয় যখন সে পীড়িত অবস্থায় সেবা যত্ন পায়; ক্ষুধার সময় যদি কেউ তাকে অন্ন দেয় আর রোগের সময় যদি কেউ তার সেবা করে, তা হ'লে সে যেমন কৃতজ্ঞ হয় তার আর কোনো তুলনা নেই। কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সমষ্টি গত ভাবে, মানুষ যদি মানুষকে আনন্দ দিতে চায় তো এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। মানুষকে বশ করবার বা খুসী করবার জন্যে এর চেয়ে সোজা ব্যবস্থা আর কিছু হয় না। আমাদের দেশে পীড়া বিস্তর, অথচ তার পরিচর্য্যার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব। এটি কিন্তু রাজার কার্য্য, আর প্রজারঞ্জন করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত ক্ষেত্র। হয়তো রাজ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাও করেছেন, কিন্তু এর একটা দিকে আমরা তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ দেশে রোগপীড়া হয় অনেক রকম, যার ঘরে ব'সেও যা হোক চিকিৎসা করানো চলে, না হয় হাঁসপাতালে গেলে কিছু একটা সুব্যবস্থা হয়। রোগের তুলনায় হাঁসপাতালের সংখ্যা কম হ'লেও অন্য সমস্ত রোগেরই যেমন তেমন একটা ব্যবস্থা হ'য়ে যায়। কিন্তু যে রোগ দিনের পর দিন এখন উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছে,—সে হচ্ছে যক্ষ্মা,—যার বাড়ীতে

থেকেও কোনো চিকিৎসা হয় না, হাসপাতালেও যার কোনো স্থান দেওয়া হয় না (দু এক জায়গায় অল্পই স্থান আছে মাত্র), অথচ যার উপযুক্ত চিকিৎসা না হ'লে কিছুতেই বাঁচানো যেতে পারে না। এই রোগটি যেন সব দিক দিয়েই মৃত্যুকে একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে। এমন লোকদেরই যক্ষ্মা বেছে বেছে ধরে যাদের চিকিৎসা করাবার কোনো সংস্থান নেই, দুমুঠো খেতেই জোটে না,—এবং সেইজন্যেই তাদের যক্ষ্মা হয়। আরো ধরে তাদের যারা অনাচার অনিয়ম, ও অত্যাচার ক'রেই জীবন কাটায়, স্তুতরাং সামর্থ্য থাকলেও বাঁধা নিয়মে না থাকলে তাদের আরোগ্য হওয়া অসম্ভব। এই সমস্ত যক্ষ্মারোগী শয্যাশায়ী নয়, অসহায় অবস্থায় তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও তাদের স্থান নেই। ঘরেও তারা থাকতে পারে না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, স্তুতরাং কেবল নিজেদের জীবন বিপন্ন করে না,—আরো পাঁচজনের জীবন বিপন্ন ক'রে তোলে। এই ভাবেই তারা মরছে এবং রোগের বীজ ছড়াচ্ছে। এই রোগের চিকিৎসা এবং নিবারণ দুইই হ'তে পারে একমাত্র স্যানিটেরিয়মের প্রতিষ্ঠার দ্বারা। স্যানিটেরিয়মের যে ব্যবস্থা তা অন্য কোনো সাধারণ হাসপাতালে হ'তে পারে না, সেই জন্যেই সমস্ত সভ্য দেশে যক্ষ্মারোগের বিশেষ বিশেষ স্যানিটেরিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। স্যানিটেরিয়মে থাকতে পেলে অনেক রোগী বেঁচে ওঠে,—যক্ষ্মা হলেই যে নিশ্চয় মরতে হবে এমন কোন কথা নেই। এখন সমস্ত দেশেই তাই বহু স্যানিটেরিয়ম তৈরী হয়েছে,—ভারতবর্ষেও ৪।৫ টা স্যানিটেরিয়ম আছে,—কিন্তু এই বাংলা দেশে আছে মাত্র একটি। তাও রাজকর্তৃপক্ষের তৈরী নয়, একজন দয়াশীল ব্যক্তি মরবার সময় কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তাইতেই সেটি গড়ে উঠেছে, এখন অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাতে কিছু সাহায্য করেন। এখানেও স্থান অত্যন্ত পরিমিত, কয়েকজন মাত্র রোগীর জায়গা হয়। এত বড় দেশে ঐ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকাতে লোকের উপকার হওয়া অপেক্ষা কেবল ক্ষোভেরই সৃষ্টি করে, সকলেই সেখানে যেতে চায় কিন্তু কেউই সেখানে জায়গা পায় না। মাদ্রাজের দুটি স্যানিটেরিয়মও এর চেয়ে অনেক বড়, এখানকার লোকে চেষ্টা ক'রে সেখানেও যায়। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কি ঐ রকম একটা স্যানিটেরিয়ম এ দেশে করতে পারেন না? এ রকম স্যানিটেরিয়মের কি উপকারীতা তা অবশ্য আমাদের বলতে হবে না, কর্তৃপক্ষ আমাদের চেয়ে তা ঢের বেশী জানেন। আমাদের দেশে এর একান্ত প্রয়োজন হয়েছে, এর চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় জিনিষ বাংলা দেশের জন্য উপস্থিত আর কি আছে? কর্তৃপক্ষ যদি অন্যদিকে বেশী অর্থব্যয় না ক'রে এই জুবিলি উপলক্ষ্যে একটি স্যানিটেরিয়মের প্রতিষ্ঠা করতেন, এবং তার নাম হোতো জুবিলি স্যানিটেরিয়ম—তা হ'লে আজকের দিনের এই জুবিলি উৎসব চিরস্মরণীয় ও চিরগৌরবান্বিত হ'য়ে থাকতো। চিরস্থায়ী প্রজারঞ্জনের এর চেয়ে বেশী সুযোগ আর কিছু আছে বলে আমাদের মনে হয় না, সেই জন্যে জুবিলি উপলক্ষ্যে সেটার উল্লেখ করলাম।

"প্রবন্ধের মধ্যে বিজ্ঞাপন"—

এই নাম দিয়ে গত মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে একটি উল্লেখযোগ্য লেখা বেরিয়েছে। সাধারণের দৃষ্টি এ দিতে আকৃষ্ট হওয়া দরকার এবং জ্ঞানবিস্তারের অজুহাতে আজকাল যে বিজ্ঞাপন বিস্তারের অভিনব প্রণালীর সূত্রপাত হয়েছে, সকলের সে বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার। আজকাল রোগ-পীড়া সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞানলাভ করতে অনেকেই কৌতূহলী,—তাই সাময়িক পত্রে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসাবিধি সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুলে অনেকেই সেগুলি মন দিয়ে পড়েন। সাধারণের এই দুর্ব্বলতাটুকুর সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ আজকাল কয়েকটি পেটেন্ট ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে চালিয়ে দিচ্ছেন। এমন চতুরতার দ্বারা এই সব প্রবন্ধ লেখা হয় যাতে সাধারণে বুঝতেই পারে না যে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই তা লেখা হয়েছে,—তারা মনে করে দেশের লোকের মঙ্গলের জন্যেই এ সব লেখা, আর তাদের ব্যাধিমুক্ত করবার জন্যেই ওষুধের নামটি পর্য্যন্ত জানিয়ে দেওয়া এর একমাত্র উদ্দেশ্য। সন্দেহ করবার কোনো কারণ থাকে না, যেহেতু ডাক্তারের স্বাক্ষর দিয়েই এ জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনকে আজকাল লোকে অবহেলা করে কিন্তু এই সব প্রবন্ধকে অবহেলা করে না, সেই জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এতে ব্যবসা বিশেষের উন্নতি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশের যে কি ক্ষতি করা হচ্ছে তা লেখকরা দেশবাসী হ'য়েও বুঝে দেখছেন না।

যক্ষ্মারোগ সম্পর্কীয় প্রবন্ধের মধ্যে রচি কোম্পানীর 'সিরোলিনের' গুণের উল্লেখ ক'রে এই রকম নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন উপর্য্যুপরি কয়েকখানা কাগজে বেরিয়ে গেছে। কাগজওয়ালারা কেউ এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেন কি, একমাত্র 'শনিবারের চিঠি'তেই তার প্রতিবাদ দেখলাম। 'শনিবারের চিঠি' যা লিখেছেন তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে ঐ সকল প্রবন্ধে যা লেখা হয়েছে তা সমস্তই মিথ্যা। ডাক্তার হ'য়ে লেখকরা কেমন করে এই সব মিথ্যার প্রচার করছেন তাই ভেবে আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি। ডাক্তারের কি এ রকম প্রবন্ধ লেখা উচিত? কাগজওয়ালার কি উচিত তা ছাপতে স্বীকার হওয়া আর এ দেশের জার্ণালিষ্ট এসোসিয়েশনেরও কি এ সম্বন্ধে কোনো কর্ত্তব্য নেই?

ইদানিং দেখা যাচ্ছে 'সিরোলিনের' কথা ছেড়ে এখন ঐ রচি কোম্পানীরই প্রস্তুত 'রচিটোন' নামে অপর একটি পেটেন্ট ঔষধ সম্বন্ধে আবার কয়েকটি কাগজে উত্তরোত্তর প্রবন্ধ বেরুতে আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন রোগে রচিটোনের বিভিন্ন উপকারীতা দেখিয়ে এই সব প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। কেউ লিখছেন প্রসূতিকে দুর্ব্বল অবস্থায় ফেলে রাখা ভয়ানক অন্যায়, যখন 'অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার' নূতন ওষধ বেরিয়েছে তখন তাড়াতাড়ি সেই 'রচিটোন' খাইয়ে তাকে

চাঙ্গা ক'রে নেওয়া উচিত। কেউ লিখছেন শক্ত রোগের পর দুর্ব্বলতা সারতে বড় দেরী হয়, রচিটোন খেলেই তা অবিলম্বে সেরে যাবে। কেউ লিখছেন ধাতুদৌর্ব্বল্য এখনকার দিনের এক বদ রোগ; কিন্তু 'রচিটোন' যখন রয়েছে তখন আর ভাবনা কি? এ সব কথা সত্য কি না, এবং বিশেষ ক'রে রচি কোম্পানীর যত পেটেণ্ট ওষুধ আছে কেবল সেইগুলিই আজকালকার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধে বিশেষ ক'রে স্থান পাবার উপযুক্ত কি না,—তা আমাদের বিচার করবার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি সাধারণকে এই সব কথা জানাবার জন্যে লেখকদের হঠাৎ এত আগ্রহ হবার কারণ কি? তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু বটে, কিন্তু কোনো পেটেণ্ট ওষুধের সন্ধান তো তারা জানতে চায় না! যদি তাদের রোগ হয় এবং কোনো ওষুধের দরকার হয় তখন তারা ডাক্তারের কাছে যাবে,—ডাক্তার তাদের রচিটোনই খেতে দিক বা সিরোলিনই যেতে দিক তাই তারা খাবে। তা না ক'রে তারা নিজেদের রোগ নিজেই স্থির করবে এবং নিজেই তার চিকিৎসা করবে এইটেই কি বাঞ্ছনীয়? কি কারণে তাদের অসুস্থতা হোলো এবং কিসের দ্বারা সে কারণ দূর হবে তা কি তারা এই সব প্রবন্ধ থেকে বুঝে নিতে পারবে?

রচি কোম্পানীর বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তারা নিজেরা বাংলাও জানে না, প্রবন্ধও লেখে না। তারা এ দেশে ব্যবসা করতে এসেছে। হয়তো শুনেছে এ দেশের এই রকমই নিয়ম, এখানে এই রক ম ক'রেই লোককে ভোলাতে হয়, তাই প্রবন্ধাকারে ঐ সব কথা কাগজে প্রকাশ করে। কিন্তু সেগুলি লেখে যারা তারা তো এ দেশেরই লোক, এবং তারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত,—তাদের এ কি রকম ব্যবহার? তারা যদি কোম্পানীকে বুঝিয়ে দেয় যে এ কাজটা অন্যায়, তা হ'লেই কোম্পানী হয় তো নিরস্ত হয়। কিন্তু তা তারা করে না। এর একমাত্র কারণ দেশের প্রতি তাদের কোনো দরদ নেই। তারা একটু ভেবে দেখে না যে দেশের লোককে এ ভাবে প্রতারিত করার কোনো অর্থ হয় না,—তারা অনর্থক ঐ সব ওষুধ কিনবে এবং অনর্থক তাদের কষ্টার্জ্জিত পয়সা নষ্ট করবে। কোথায় কোন ওষুধ প্রয়োজন তা তারা কিছুই বুঝবে না। আসল কথা, এই সব প্রবন্ধ লেখক উচিত অনুচিতের কথাও ভাবে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাবে না,—বিদেশী পেটেণ্ট ওষুধের সুখ্যাতির কথা অমন বেমালুম নির্লজ্জ ভাবে কেন যে তারা লেখে তা হয় তো নিজেই জানে না।

কেবল ঐ প্রবন্ধ লেখক গুলিই বা কেন আজকাল আমাদের সকলের মধ্যেই এমন ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। আমরা মনে করি যে আমরা শিক্ষিত কি না, তাই আমাদের শত খুন মাপ। দেশের লোককে আমরা কেবল পিঠ চাপড়ে বেড়াবো। মূর্খ সাধারণকে আমরা কৃপা করছি। কিন্তু আমাদের চরিত্র কি? আমাদের কেবল শিক্ষাটুকুই আছে। তা ছাড়া কোনো নীতির বালাই নেই, উদ্দেশ্যের ঠিক নেই, কথার ঠিক নেই, দায়িত্ব বোধ নেই,—যা খুসী তাই বলাই

আমাদের বিশেষত্ব। মনে করি নিজের স্বার্থ টুকু চিনেছি,—কিন্তু নিজের স্বার্থ যে কি তাই জানি না। পরে যেটা জানিয়ে দেয় স্বার্থ সেইটেকেই মনে করি নিজের স্বার্থ। যাকে মনে করছি স্বার্থ তা যে মরীচিকা মাত্র এটুকু ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই। বাংলা দেশ আজ এমনি ক'রেই পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলতে হবে! নইলে মিথ্যার আবহাওয়া চারিদিকে এমন ঘিরে আসছে কেন?

আমাদের অনুরোধ, এখনকার শিক্ষিতের দল যেন একটু বুঝে দেখেন যে সাধারণকে এঁরা যত বোকা মনে করেন, তারা তত বোকা নয়। তাদের যে বুদ্ধি ভগবান দিয়েছেন সেটা স্বাভাবিক বুদ্ধি,—বিকৃত বুদ্ধি নয়। কাজে কাজেই তারা সব চিনতে পারে। তাদের কাছ থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে তাদেরই উপর কলম চালাবেন, এটা হয় না। তাদের প্রবঞ্চনা ক'রে নিজের গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবেন, এটাও হয় না। একটা কথা কেবলই মনে রাখবেন যে sincerity ছাড়া কিছুই করবার উপায় নেই। No mere posing would do.

আমরা জানি কোনো সদাশয় মাড়োয়ারী স্যানিটেরিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছেন, আর গভর্ণমেণ্ট আরো কিছু টাকা তার সঙ্গে দিয়ে ক্যালিম্পংয়ে একটি নতুন স্যানিটেরিয়ম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করছেন। ক্যালিম্পং খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, সুতরাং স্যানিটেরিয়মের উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু গরীব বাঙালী কি ততদূর পৌছতে পারবে? তার একটা ব্রাঞ্চের মত আর একটা স্যানিটেরিয়ম করা দরকার বাংলা দেশের মাঝখানে, যেখানে রোগী সহজ প্রবেশাধিকার পাবে আর যেখান থেকে প্রয়োজন হিসাবে তাকে ক্যালিম্পংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাংলার বুকের উপর এই রকম একটা স্যানিটেরিয়ম হওয়া নিতান্ত দরকার।

Printed and published by Dhirendra Nath Modak, from 5, Nabin Sircar Lane, Calcutta and Printed at The Annapurna